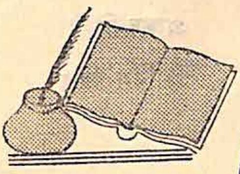
সমকালীন সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

সমকালীন সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
(প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৪

মূল্য ৩৲ (তিন টাকা মাত্র)

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅনিল মিত্র

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু

করকমলেষু

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ প্রবন্ধই গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে লেখা। পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়েছে—'শনিবারের চিঠি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' শারদীয়া সংখ্যা ও রবিবাসরীয় আলোচনী বিভাগ, 'জয়শ্রী', 'পূর্বাশা', 'গণবার্তা', 'কথাশিল্প', 'সংকেত', 'মঞ্জরী', 'বাটানগর ম্যাগাজিন' প্রভৃতি। 'শনিবারের চিঠি' থেকে তিনটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে—সেগুলি "প্রসঙ্গ কথা" পর্যায়ে মুদ্রিত হয়েছিল। তন্মধ্যে "শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" নামীয় নিবন্ধটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে লেখা। "প্রমথ চৌধুরী" নিবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর (১৯৪৬) অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল। লেখাটি অপেক্ষাকৃত পুরনো হলেও বিষয়বস্তুর যুগোপযোগিতা স্মরণ করে তা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কলিকাতা
১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৪

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সঙ্গীত পরিক্রমা

বাংলার সাহিত্য

বাংলার সংস্কৃতি

অম্লমধুর

অথ বর্ণপরিচয় কথা

আত্মদর্শন

সূচীপত্র

সাহিত্যে কালের প্রভাব

সমসাময়িক সাহিত্য আর অতীত সাহিত্যের প্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য আছে বলে মনে হয়।

অবশ্য কালের হিসাব সর্বদাই আপেক্ষিক ; আজ যা সাময়িক দু'দিন বাদে তা-ই অতীত বলে গণ্য হতে বাধ্য ; আর অতীতটাও যে সকল কালের জন্য অতীত ছিল না তা-ও সহজবোধ্য। এই বিচারে অতীত আর বর্তমান সাহিত্যের ভিতর প্রভেদ নিরূপণের চেষ্টা কতটা যুক্তিযুক্ত তা একটা প্রশ্ন বটে। তবে এ প্রশ্ন আমরা অনায়াসেই এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারি এই যুক্তিতে যে, সাহিত্যের বেলায় কালের হিসাব শুধু তার বয়সেরই পরিমাপ নয়, তার স্বভাবেরও পরিমাপ। মানুষ শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হয়। জৈব স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বয়োবৃদ্ধির এক-এক স্তরে তার দেহমনের এক-এক রকম পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন মৌলিক নয় ; সকল পরিবর্তনের অন্তরালে নিহিত থাকে তার ব্যক্তিত্ব, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রের দ্বারা গ্রথিত। মানুষের বয়স ক্রমাগত বেড়ে চলে, বয়সের বৃদ্ধি আর অবস্থার ভেদ অনুসারে তার মানসিক অবস্থার আনুপাতিক বিকার ঘটে, দেহ ঝরে ঝরে এক সময় দেহ বিনাশের দশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মানবের ব্যক্তিত্ব থাকে পূর্বাপর মূলতঃ অক্ষুণ্ণ। এই ব্যক্তিত্বেরই অপর নাম স্ব-ভাব ; আর এই স্ব-ভাবের দ্বারাই মানুষের সত্যকার পরিচয়।

সাহিত্যকে বুঝি এই নিয়মে বাঁধা চলে না। গোড়ায় যে কথা বলা হয়েছে সে কথার পুনরাবৃত্তি করি : সাহিত্যের বেলায় কালের পরিবর্তন তার স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটায়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যে শুধু প্রাচীনত্বই অর্জন করতে থাকে তা-ই নয়, তার রঙ রস স্বাদ গন্ধও

বদলে যায়। একই সাহিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন যুগের পাঠক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। পাঠকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা শুধুমাত্র পাঠকেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা সাহিত্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পাঠকের রুচি আর ইচ্ছার আলো যখন সাহিত্যের গায়ে ঠিকরে পড়ে, সাহিত্যের রঙ বদলে যায়। তার অর্থ, সাহিত্যের যেন নিজস্ব কোন রঙ নেই, জলের মত যখন যে পাত্রে তাকে রাখা হয় সে পাত্রের রঙেই তার রঙ। কথাটার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জনের আভাস থাকলেও এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, যুগভেদে সাহিত্যের রঙ বদলায়। একই সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন যুগের পাঠকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, সাহিতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নেই।

উপরের কথায় এ রকম ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, কৃকলাসের মত সাহিত্য বহুরূপী, তার অন্তরে সার্বভৌম ও সর্বকালীন কোন সত্যরূপ নিহিত নেই। বলা বাহুল্য, এই ধারণার বিরুদ্ধে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। উপরে যে কথা বলা হয়েছে তা মুখ্যতঃ পাঠক আর তার কালের দিকে চোখ রেখেই বলা হয়েছে। যুগে যুগে সাহিত্যের স্বরূপের আর তার রসগ্রহণের মানদণ্ডের পরিবর্তন হয় বলে এমন কথা মনে করবার হেতু নেই যে সৎ সাহিত্যের স্থায়ী কোন লক্ষণ নেই। তা হলে সত্য শিব সুন্দর কথাগুলির অর্থ থাকে না, যদিও আমরা জানি ও তিনটি বস্তুই সত্য। সাহিত্যের উৎকর্ষ ও মঙ্গলকরতা সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শের উপর নির্ভরশীল, এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তা হলে কথাটা দাঁড়ালো এই যে, সাহিত্যের একটা কালনিরপেক্ষ নিজস্ব আদর্শ আছে, কিন্তু সে আদর্শের উপর সাহিত্যের নির্ভর একান্ত নয়। সাহিত্য গভীরভাবে কালের প্রভাবের অধীন। সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শকে সকল কাল এক ভাবে গ্রহণ করে না। পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতায় নৈর্ব্যক্তিক আদর্শেরও রকমফের ঘটে। এই প্রকারভেদ মাত্র বাহ্য পরিবর্তনের নয়, তাকে প্রায় মৌলিক রূপান্তর বলা চলে।

আরও একটি কথা। যুগ থেকে যুগে যেমন সাহিত্যের রঙ বদলায়, তেমনি প্রাচীনত্বের ফলেও সাহিত্যের স্বাদগন্ধের বদল হয়। যে কালে রামায়ণ মহাভারত লিখিত হয়েছে সেই সেই কালে রামায়ণ মহাভারত ছিল সাময়িক সাহিত্য। তখনকার মানুষ রামায়ণ-মহাভারত থেকে যে স্বাদগন্ধ আহরণ করেছে পরবর্তী কালের মানুষ তা হতে শুধু ভিন্নতর স্বাদগন্ধই আহরণ করে নি, গভীরতর স্বাদগন্ধও আহরণ করেছে। রামায়ণ-মহাভারতের উপর দিয়ে বৎসর-পরম্পরায় কালের স্রোত যত গড়িয়ে গেছে, তত তাদের রসোপভোগ গাঢ়তর হয়েছে। যা এক কালে ছিল শুধুমাত্র ঘটনার সাদামাটা ব্যাখ্যান বা বিবৃতি, বহু শতাব্দীর বহু বহু মানুষের ভক্তি আর অনুরাগ-চিহ্ন ধারণ করে তা-ই পরিণামে হয়ে উঠেছে অপূর্ব অর্থান্বিত কাব্য। ভাবসাযুজ্যের প্রসাদে রচনা দুটির ভিতর নূতন নূতন ভাবের যোগ হয়েছে; শব্দার্থ সূক্ষ্মতর মহিমা লাভ করেছে; সহজ কথার সমষ্টি রসাত্মক বাক্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ সবই হয়েছে কালের প্রসাদে। সাহিত্যের উপর কালের রঙের ছোপ যদি না লাগত, সাহিত্য কখনও ক্লাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হতে পারত না। সাময়িক সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকরত্বই সে ক্ষেত্রে সাহিত্যের চিরন্তন বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াত।

রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে যে কথা, সকল শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেই সেই কথা। সাহিত্যের রসবিচারে কাল একটি মস্ত গণনীয় বস্তু। বহু সাহিত্যসৃষ্টি কালের দ্বারা বাতিল হয় এ কথা যেমন ঠিক, বহু সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা কালের দ্বারা দৃঢ়তর হয় এ কথাও তেমনি ঠিক। অর্থাৎ কাল সাহিত্যকে মারেও, রাখেও। সকল অপকৃষ্ট সাহিত্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার জন্য কাল সম্মার্জনী হস্তে প্রস্তুত হয়েই আছে। অপর পক্ষে সৎ সাহিত্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘরে তুলতে এবং তার প্রতিষ্ঠার পথ সুগমতর করতেও কালের তৎপরতার অন্ত নেই। কালরূপী বিচারকর্তা লোকপ্রিয়তার স্বীকৃত জয়টিকা একবার যদি কোন সাহিত্যের ললাটে চড়ায়, এবং কয়েকটি যুগের পরীক্ষার পরও যদি এই লোকপ্রিয়তা ধোপে টেকে,

তা হলে কাল ক্রমশঃ এই লোকপ্রিয়তাকে গভীরতর করতে থাকে। সাহিত্য তখন আর প্রচলিত অর্থে সাহিত্যমাত্র থাকে না, তা হয়ে পড়ে জাতির অন্তরস্থ সম্পদ। ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি এবং একাধিক লোকসাহিত্যের ভাগ্যে এই শুভ পরিণাম ঘটেছে। এখন আর সে সকল, গ্রন্থ বা রচনার স্তরে আবদ্ধ নেই ; তাদের প্রভাব দৃঢ়বদ্ধ সংস্কাররূপে জাতির মনে নিত্য ক্রিয়াশীল।

সংস্কারের কথায় দর্শনশাস্ত্রের একটি পরিচিত তত্ত্বের কথা মনে পড়ল। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেন, দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে অভ্যাস আর অভ্যাস মাত্র থাকে না, তা হয়ে পড়ে সংস্কার ; আর অভ্যাস সংস্কার রূপে একবার জাতির মনে দৃঢ়প্রোথিত হলে তা পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বংশানুক্রমে বাহিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। লামার্ক অভিব্যক্তিবাদের এই তত্ত্বটিকেই একটু ঘুরিয়ে তাঁর বিখ্যাত Theory of Acquired Modification মত খাড়া করেন। প্রাণিজগতের কায়িক বিবর্তনের ক্ষেত্রেই যদিও মুখ্যতঃ তাঁর এই মত প্রযোজ্য তবু মনে হয়, এই তত্ত্ব স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। বিশেষতঃ, উপরে আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছি তাতে আমাদের আলোচনার পক্ষে এই তত্ত্বটি বিশেষ উপযোগী। বলা হয়েছে যে, সাহিত্য যতই প্রাচীনত্ব অর্জন করতে থাকে ততই তার রসোপভোগ পূর্ণতর হতে থাকে। এক কালে যা সাময়িক সাহিত্যমাত্র ছিল, কালাতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে তা নূতন নূতন রসে ও রূপে সমৃদ্ধ হয়ে ক্লাসিকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই যে দৃষ্টান্ত, এও অর্জিত সংস্কারের দৃষ্টান্ত বই কিছু নয়। এখানেও সেই একই প্রক্রিয়ার সন্ধান পাচ্ছি। এককালীন রচনা দীর্ঘ দিনের পঠন-পাঠন, শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রসাদাৎ সংস্কারে গিয়ে দাঁড়ালো আর সেই সংস্কার পরাম্পরাক্রমে বাহিত হয়ে এক সময় জাতির মানসিক সত্তার অঙ্গ হয়ে উঠল—সংস্কার সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হল।

রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির বেলায় ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে বলে

মনে হয়। আজ যখন আমরা রাম-চরিত্র কিংবা সীতা-চরিত্র অনুধ্যান করি, তাঁদের ব্যক্তিরূপে দেখি না, দেখি ভাবরূপে, আদর্শের প্রতীকরূপে। লক্ষ্মণের চেহারা আঁচ করতে সময় লাগে, কিন্তু তাঁর আচরিত ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ আচম্বিতে মনে গাঁথা হয়ে যায়। সমসাময়িক মানুষের চোখে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সম্ভবতঃ নিতান্তই ব্যক্তিমানুষের প্রতীক ছিলেন; শত শত বৎসর তাঁদের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে এখন তাঁরা হয়ে উঠেছেন শ্রেষ্ঠ কয়েকটি আদর্শের প্রতীক। আর শুধু ব্যক্তি-চরিত্রই বা কেন, খোদ রামায়ণ-মহাভারতের চেহারাই কি বদলে যায় নি? আজ কথায় কথায় আমরা রামায়ণ-মহাভারত থেকে শ্লোক উদ্ধার করি; রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত প্রসঙ্গ ভারতবর্ষীয় লেখকমাত্রেরই রচনার ছত্রে ছত্রে পুরাস্মৃতি রূপে লীন হয়ে আছে; সাহিত্যে উপমা প্রয়োগ করতে গেলেই রামায়ণ-মহাভারতের পাত্র-পাত্রী আর ঘটনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না; মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ গীতা ধর্মানুরাগীদের মুখে মুখে। রামায়ণ-মহাভারত যে যে যুগে সংকলিত হয়েছিল, সেই সেই যুগে কিংবা তাদের অব্যবহিত পরবর্তী যুগগুলিতে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুটির এমন ব্যাপক প্রভাব ছিল না। খ্রীষ্টীয় সমাজে বাইবেলের যে স্থান, আমাদের সমাজে রামায়ণ-মহাভারতেরও সেই স্থান। ইংরেজী সাহিত্য বাইবেলের সংস্কার দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে আচ্ছন্ন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারতের সংস্কার তেমনি বাংলা সাহিত্যের অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে।—এদের উড়িয়ে দিলে বাংলা সাহিত্যকেই উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাহিত্যের ঐশ্বর্য সম্পাদনে কালের ভূমিকা যেমনি বিরাট তেমনি চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন যে সকল সাহিত্য জাতির মূল্যবান সম্পদরূপে সংরক্ষিত আছে, এবং যাদের নিয়ে আমাদের মুখ্য গর্ব, তাদের স্বকীয় উৎকর্ষ অবশ্যই তাদের ব্যাপক লোকপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কালের দানও বড় কম নয়। সাহিত্যের স্বকীয় মহিমা ছাড়াও কালের আরোপিত একটি মহিমা আছে। শেষোক্ত মহিমা সাহিত্যকে কম গৌরব দান করে না।

আমরা যে ক্লাসিক্-পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থের নামেই মাথা নোয়াই, তা গ্রন্থের স্বকীয় উৎকর্ষের জন্যও বটে, কালের দ্বারা পুষ্ট গ্রন্থের বাড়তি ঐশ্বর্যের জন্যও বটে। বাড়তি ঐশ্বর্যের পরিমাণ বড় কম নয়; অনেক সময় গ্রন্থের স্বকীয় ঐশ্বর্যকেও তা ছাড়িয়ে যায়।

অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কেও কালের নিয়মটুকু খাটে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা ধরা যাক। বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাব্যমহিমা সুবিদিত। সে কাব্যমহিমা যুগ যুগ ধরে রসিক সুজনদের আনন্দ দেবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক গানের মধ্যে দিব্য অমৃতের সন্ধান পাবে। কিন্তু আপাততঃ প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে কাল নিয়ে। কালের দান এই ক্ষেত্রে কতটা এবং কী পরিমাণ রয়েছে সেটা ভেবে দেখা দরকার। বৈষ্ণব মহাজনদের এমন সমস্ত পদ আছে যা শোনা কিংবা পড়া মাত্র আমরা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ চকিত হয়ে উঠি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা আকস্মিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভাবের প্রচণ্ড সংঘাতে আমাদের অনুভূতি মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে ওঠে যখন কানের কাছে গুঞ্জরিত হতে শুনি:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ছত্রগুলির মধ্যে ভালবাসার গভীর আকূতিই যে মর্মরিত হতে শুনি তা নয়, এই চরণচতুষ্টয় পাঠ কিংবা শ্রবণ করে এযাবৎ যত অগণিত পাঠক-শ্রোতার প্রেমব্যাকুল চিত্ত অব্যক্ত বেদনায় হাহাকার করে উঠেছে তাদের হাহাকার-ধ্বনিটাও যেন সেই সঙ্গে কান পেতে শুনতে পাই। কবির বেদনার সঙ্গে পাঠকের বেদনা মিশে ছত্র কয়টির আবেদন আমাদের চোখে বহুগুণিত হয়ে ওঠে। কবির বেদনা তাঁর স্বীয় কালের আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমার দ্বারা সীমিত; পক্ষান্তরে পাঠকের (বা শ্রোতার) বেদনা বিভিন্ন কালে ছড়িয়ে

রয়েছে। কালের কপোলতলে বিলম্বিত শুভ্র সমুজ্জল বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মুক্তা দিয়ে যেন সে বেদনা তৈরী। অগণিত রসিকচিত্তের বেদনা যেন কালেরই বেদনা। কালের প্রলেপ ব্যতিরেকে আলোচ্য কবিতার দেহ এতদূর দীপ্তিমান হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ।

এমনি আরও বহু ছত্র আছে, যার উপর ভিন্ন ভিন্ন কালের পাঠকের হৃদয়-স্পর্শ তাদের কাব্যসৌন্দর্য বাড়িয়েছে। চণ্ডীদাসের বহুখ্যাত পংক্তি "আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া" কিংবা "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই", কিংবা বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" কিংবা সমশ্রেণীর কবির সমজাতীয় ভাবোদ্দীপক চরণসকল যখন আমরা গীত বা উচ্চারিত হতে শুনি, আমাদের সমগ্র সত্তা সহসা প্রচণ্ড আবেগের দোলায় দোলায়িত হয়ে ওঠে। বহু মানুষের চিত্তের দোলা এই দোলার সঙ্গে মিশে আছে। এক-একটি কবিতা বা কবিতাংশ পড়ে এই যে আমাদের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়, এই আবেগ সবটুকু আমাদের নিজস্ব নয়; এই আবেগের অনেকখানিই আমরা জাতীয় সংস্কার রূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস আর অনুশীলনের ফলে কাব্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বোধ আমাদের সত্তার গভীরে অনুস্যূত হয়ে আছে; পুরাতন-পরিচিত যে কোন সুন্দর ছত্র দেখলেই আমাদের সে বোধ মথিত হয়ে ওঠে— আমাদের সমগ্র সত্তা যেন টঙ্কার দিয়ে ওঠে। এর অর্থ অতি পরিষ্কার। কাব্যের স্বকীয় সৌন্দর্যের উপর অধিকন্তু হিসাবে কাল যখন তার আপন সৌন্দর্য প্রক্ষেপ করে তখনই এ জিনিসটি ঘটে। যে কোন পঠিত বস্তুর পুনঃপঠন সমধিক উপভোগ্য, সমধিক ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে কালের উপযোগিতার তুলনা নেই। সাহিত্যের ভাল-মন্দ, খাঁটি-মেকীই যে শুধু কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় এমন নয়, সাহিত্যানুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলবার জন্যও কালের নিকষ সমান আবশ্যক।

ছড়া জাতীয় কবিতা এ কথার আর একটি প্রমাণ। আমরা যখন শিশুর মুখে শুনি:

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ডান মিরগেল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি,
ঢুলী গেল সেই কমলাপুলী ;
কমলাপুলী টে টা সূয্যিমামার বে টা !
হাড় মড়মড় কেলে জিরে,
রস্থন কুস্থম পানের বিড়ে ;
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
ঝালের নাড়ু কিনে খাই ;
ঝালের নাড়ু বড় বিষ
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ !

কী তার অর্থ কী তার ভাব কিছুই জানি না, তবু মনে হয় সমস্ত অন্তরটাতে যেন কিসে চকিত মন্থনের আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে গেল। মনে হতে পারে, ছন্দের দোলা আর ধ্বনি-মাধুর্যের জন্যই এরকম ঘটে, কিন্তু ঠিক তা নয়। কবিতার ভাবগ্রহণের পক্ষে ছন্দ আর ধ্বনি একটা মস্ত সহায়, তবে ছড়াজাতীয় কবিতায় আমাদের মনে যে নিবিড়-গভীর অনুভূতির স্থষ্টি হয়, একা ছন্দ বা ধ্বনিসুষমার দ্বারা তা কখনও স্থষ্টি হতে পারত না। সেই জাতিগত সংস্কারের কথায়ই ফিরে আসতে হয়। প্রতিটি ছড়ার পিছনে দীর্ঘ দিনের সংস্কার মিশে রয়েছে। পরম্পরাক্রমে বাহিত শ্রুতি ও স্মৃতি ছড়াগুলির ভিতর প্রচুর উদ্বৃত্ত মাধুর্য এনে দিয়েছে। কবে কোন্ এক সময় নির্দিষ্ট একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করে উপরের ছড়াটি রচিত হয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে জাতির চিত্তে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। কালক্রমে ঘটনার স্মৃতি মুছে গেছে, কিন্তু ছড়া বেঁচে আছে। ছড়ার রচয়িতা কালের হস্তে ছড়াটিকে সমর্পণ করে পরম নিশ্চিন্ততায় নিজের বিলোপ ঘটিয়েছেন। এইভাবেই ছড়া গীত গান গাথা ইত্যাদি জাতিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে থাকে। জাতির চৈতন্যের মধ্যে তাদের বিরামহীন সততসঞ্চরণ। একটি অখণ্ড

স্মৃতির প্রবাহের আকারে তারা আমাদের মনোজগতের তলা দিয়ে নিঃসাড়ে বয়ে চলেছে। নিঃসাড়ে কিন্তু মৃতবৎ নয়। একটু টোকা দিতেই স্মৃতির স্রোতের জল ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে। ছড়ার ছত্র উচ্চারিত হওয়া মাত্র দূর কালের সঙ্গে এ কালের যোগ স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে—আমাদের মগ্ন চৈতন্য সাড়া দিয়ে উঠছে।

শিশুরা কবিতার ছন্দ ভাব অর্থ সামান্যই বোঝে, তবু কবিতা তাদের প্রিয়। বিশেষ করে ছড়া-জাতীয় কবিতা। এমন অবলীলায়িত সহজ ছন্দে শিশুরা ছড়া আবৃত্তি করে যে দেখলে কে বলবে তারা ছড়ার সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় নি? ছড়া যেন তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সহজাত সম্পদ। ন্যাসরূপে এ সম্পদ কালের হস্তে ন্যস্ত—কাল সেই গচ্ছিত ধন শিশুদের হাতে হাতে পুরুষানুক্রমে বিলিয়ে ফিরছে। ছড়া জাতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম মূল্যবান স্মারক—এইজন্যই জাতির চিত্ত-উদ্বোধনে তার আশ্চর্য পোষকতা।

মধুর ভাবের কবিতা গাথা গান কিংবা ছড়া-জাতীয় রচনার উপরই যে শুধু কালের সুগভীর প্রভাব মুদ্রিত হয় এমন নয়, আরও নানান জাতীয় রচনা আছে, যার উপর কালের স্বাক্ষর স্পষ্ট। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লাইন স্মরণ করুন:

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।

কিংবা,

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

ভাবার্থের দিক থেকে ছত্র কয়টির ভিতর অসাধারণত্ব কিছু নেই, কিন্তু শব্দচয়নের মধ্যে প্রকাশভঙ্গির অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। বৈশিষ্ট্য যে ধরনের কিংবা যে জাতীয়ই হোক না কেন, যেখানে সেটি বিদ্যমান সেখানে কাল অতি তৎপর। এ সমস্ত ছত্রের রচনাকাল দুশো বছরের সীমার মধ্যে, কিন্তু কালের তৎপরতার গুণে ছত্রগুলি সাহিত্যরসিকের স্মৃতিতে

আজও সক্রিয় রয়েছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের এই সব এবং অনুরূপ ছত্রগুলির উপর কাল তার অনুমোদনের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছে, আর জাতি তাকে অগৌণে স্বীকৃত ও স্ব-কৃত করে নিয়েছে। বহুল ব্যবহারে-ব্যবহারে এ সকল লাইন আজ বিদগ্ধ মহলের উদ্ধৃতির অযোগ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে তাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তার অপ্রমাণ হয় না, বরং মুদ্রিত অক্ষরের বন্ধন অতিক্রম করে তারা আজ দেশবাসীর মনে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। লাইন কটি এখন আর কাব্যের ছত্র মাত্র নয়; বিদ্যাসুন্দর কাব্যোপাখ্যান থেকে স্খলিত হয়ে তারা আজ প্রবচন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বচনের পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে। কালের মহিমাতেই যে এরূপ ঘটতে পেরেছে সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

ভারতচন্দ্রের এমনি আরো লাইন, যথা, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন", "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে", "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর", "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" ইত্যাদি। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত এই জাতীয় আরও বহু ছত্র আছে, যেগুলি কালের সানুরাগ অনুমোদন লাভ করে ধন্য হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দৃষ্টান্তের দ্বারাও কালের প্রভাব বোঝানো চলে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে আধুনিক কালের দিকে যতই আমরা এগোতে থাকব ততই কালের পরিধি সংকুচিত হয়ে আসতে থাকবে, কিন্তু তাতে কালের সক্রিয়তার হ্রাস হয় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ কথা বোঝানো যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাল আর এ কাল প্রায় সমসাময়িক। কবির তিরোধানের পর মাত্র দেড় দশক কাল অতিক্রান্ত হল। কিন্তু মনে হয় এরই মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের উপর কাল তার অদৃশ্য জাদু-প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের একটা বড় অংশ 'ভারতী' 'সাধনা' 'বঙ্গদর্শন' 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। আজ সেসব সাময়িক পত্রের পাতায় কবিতাগুলিকে দেখলে যেন তাদের চেনাই যায় না।

তাদের প্রথম মুদ্রিত রূপ এমনই নিরলঙ্কার আর বৈশিষ্ট্যবর্জিত যে ইতিমধ্যে কবিতাগুলিকে ঘিরে আমাদের মনোজগতে অনুভূতি আর আবেগের যে গভীর রূপান্তর-পর্ব সাধিত হয়ে গেছে তার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে যেন তাদের ঠিকমত মেলাতে পারি না। বারংবার চোখে দেখে, পড়ে, আবৃত্তি শুনে, ভাবগ্রহণ করে কবিতাগুলি আজ সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত—এই চেহারার সঙ্গে তাদের পুরনো চেহারাকে মেলানো কঠিন। 'সাধনা' 'বঙ্গদর্শন'-এর সমসাময়িক কালের পাঠক "বৈষ্ণব কবিতা", "সমুদ্রের প্রতি", "খেয়া" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিকে যে মন নিয়ে পড়েছে, বিচার করেছে, আজকের পাঠক আমরা নিশ্চয়ই সে মন নিয়ে কবিতাগুলির বিচার করি না। ইতিমধ্যে কাল সযত্ন রবীন্দ্র-কাব্যপাঠের বহুবিচিত্র বর্ণপ্রলেপে আমাদের মনের আকাশ গভীর ভাবে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে; সেই রঙের প্রতিবিম্ব যে কবিতার উপর পড়েছে তা-ই অনঙ্কিতপূর্ব বর্ণরেখার ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। কবিতার অনবদ্য স্বকীয় সৌন্দর্য তো আছেই, তার উপর কালের সৌন্দর্য যুক্ত হয়ে কবিতাগুলির আবেদন শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্র-কাব্যের উপর কাল তার জাদু বিস্তার করবার অল্পই সময় পেয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ প্রায় দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর একাদিক্রমে কাব্যসাধনা করেছেন। এটি কালের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এক হিসাবে কবির সুদীর্ঘ কাব্যজীবন আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ একটি কালবিশেষ; সেই কালস্রোত রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর দিয়ে পূর্ণ বেগে অবশ্যই বয়ে গিয়ে থাকবে। কবির অনেক কবিতা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রাচীনত্বের মহিমা অর্জন করেছিল। মানুষের ব্যক্তিত্ব অখণ্ড, ধারাবাহিক, কিন্তু দীর্ঘ আয়ুর সৌভাগ্য যিনি লাভ করেছেন তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব যেন দৃশ্যতঃ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর জীবনের এক অধ্যায় যেন আর এক অধ্যায় থেকে স্পষ্টচিহ্নিত ভাবে ভাগ করে নেওয়া চলে। কবির জীবনে এই জিনিসটি বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। কবির 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর

যুগ আর 'মহুয়া'র যুগে যেন যোজন-কালের ব্যবধান। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতা পড়ে আজ মনে হতে পারে—কিংবা পনেরো-ষোল বছর আগেও মনে হতে পারত—এক যুগের প্রান্তে বসে যেন আমরা অপর যুগের কাব্যরসাস্বাদন করছি। 'মানসী' আর 'ক্ষণিকা'র কবিতাও কালান্তরের স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। 'কথা ও কাহিনী'র বহু ছত্র আজ সাহিত্যপ্রিয় বাঙালীমাত্রের কণ্ঠধৃত এবং দূর কালের স্মারক। আমরা যখন আজকের শিশু-কিশোরের মুখে আবৃত্তি শুনি "সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত", কিংবা "পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" ইত্যাদি তখন শুধু যে কবিতার ধ্বনিই কান পেতে শুনি তা-ই নয়, কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের কৈশোর-কালকেও যেন প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই। যদিও উদ্ধৃত কবিতাগুলি কাহিনী-কবিতা মাত্র, কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ভিতর তাদের ভুক্ত করা চলে না, তত্রাচ ভাবসাযুজ্যপ্রভাবাৎ এগুলিও যেন আমাদের চক্ষে অপূর্ব অর্থান্বিত কাব্যের মহিমা লাভ করে। আপাত-বর্ণনামূলক ছত্র স্মৃতির জারক-রসে রসায়িত হয়ে ব্যঞ্জনাঘন কবিতার আকার ধারণ করে। কালপ্রভাবেই যে এ রকম ঘটে, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত এ কথার আর একটি প্রমাণ। কবির এমন বহু গান আছে, দীর্ঘদিনের পরিচয় আর শ্রবণের অভ্যাসের ফলে সেগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পরিচিত কোন গানের কলি কানের কাছে গুঞ্জরিত হওয়া মাত্র আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব যেন সপ্ততন্ত্রী বীণার মত ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কবি একাধিক স্থলে গানের সুরকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দূরস্মৃতির গন্ধমথিত পরিচিত প্রিয় গানের সুর শুনলে প্রাণে আগুনই লাগে বটে। সঙ্গীতানুরাগীরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলিকে আজকাল আর তেমন আমল দিতে চান না। সুরৈশ্বর্যের দিক থেকে কবির শেষ জীবনের গান বিনিঃশেষে তাঁদের মন কেড়ে নিয়েছে। তাঁদের প্রীতি সম্ভবতঃ সঙ্গত স্থানেই আরোপিত হয়েছে, এই নিয়ে নালিশ জানানো বৃথা। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, প্রীতির বস্তু নির্ধারণ

আর প্রীতি নির্ণয়ে কাল একটি মস্ত স্থান জুড়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচিত গানের কথা ও স্থর কবির পঞ্চাশোত্তর সঙ্গীতের কথা ও স্থরের তুলনায় হয়তো কিছু কম মৌলিক, কিন্তু তাদের জিত এইখানে যে, কাল সম্মোহের তুলি দিয়ে তাদের উপর গাঢ় একটি বর্ণপ্রলেপ লেপন করে দিয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতালি' 'প্রবাহিণী'র গানের সে সৌভাগ্য এখনও ঘটে নি, কেন না তাদের কাল আর অতি-সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সময়ের পরিসর সংক্ষিপ্ত। কাল এ সকল গানের উপর মায়াজাল বিস্তারের এখনও যথেষ্ট সময় পায় নি। কালের কড়া জ্বাল ছাড়া গানের রস দানা বাঁধতে চায় না, এ একটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

আসল কথা, সাহিত্যের রসবিচারে কালকে মর্যাদা না দিয়ে উপায় নেই। প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে অন্যান্য অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু একটি মূলগত পার্থক্য বোধ করি এই যে, একটি কালের আশীর্বাদপূত, অপরটি কালের আশীর্বাদবঞ্চিত। সত্য বটে সাময়িক সাহিত্যের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সমসাময়িক কালের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর বর্ণনা পাঠকের মনে যে নৈকট্যের বোধ জাগায়, তা অতীত সাহিত্য পাঠে লভ্য নয়। কিন্তু এই নৈকট্যের বোধ কৌতূহল আর সংবাদ-পিপাসার স্বজাতীয়, তা যথোপযুক্ত পরিমাণে সাহিত্যানুভূতির দ্বারা রঞ্জিত নয়। এই কারণে রসসন্ধানী পাঠকের নিকট বারো-আনা আধুনিক গল্পোপন্যাস সংবাদপত্রের রিপোর্টের মত মনে হয়। সেগুলি পড়ে মনের মধ্যে যে তৃপ্তি জাগে সে যেন সংবাদ-পিপাসার নিবৃত্তির পরিতৃপ্তি, আধুনিক মনের কৌতূহলের পরিতৃপ্তি তাতে যেন মনের সমস্ত কোণ ভরে না। সমসাময়িক কালের অতি স্থলিখিত স্থপাঠ্য রচনাও এই অপূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। কারণ স্মৃতির রসায়নে এখনও সেগুলি রসায়িত হয় নি। কালের স্নেহচিহ্ন এখনও তাদের ললাটে অঙ্কিত হয় নি। সাহিত্যের যাত্রাপথের উপর বহু মানবের পদচিহ্ন না পড়লে বোধ হয় সে চলা সার্থক হয় না।

রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্য থেকে গত হয়েছেন আজ ষোলো বছর হতে চলল। এই ষোলো বছরে তাঁর তিরোধান আমাদের ভিতর এমন একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, যে শূন্যতা আর কোন উপায়েই বোধ হয় পূরণ হবার নয়। কোন মহৎ ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর সান্নিধ্যে বাস করা পরম ভাগ্যের কথা। বিশেষতঃ সে মহৎ ব্যক্তি যদি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী পর্যায়ের মানুষ হন তবে তো আরো। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ উপস্থিতিটাই শুধু মনকে সঞ্জীবিত করে না, তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিপ্রতিভার অজস্র দান মনকে কানায় কানায় ভরে তোলে। কবি সব চাইতে বেশী প্রত্যক্ষ তাঁর বাণীর মধ্যে। কবির এই প্রত্যক্ষ বাণী-রূপ আমরা নিত্য অবলোকন করেছি তাঁর অজস্র রচনাসম্ভারের মধ্য দিয়ে। মাস যেতে না যেতে সাময়িক পত্রিকায় তাঁর নতুন লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, নতুন নতুন বই আমাদেরই চোখের উপর প্রকাশিত হতে দেখেছি। সাময়িক পত্র অথবা পুস্তকে নিবদ্ধ সেই সব রচনার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তত অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদে পুলকে মন পূর্ণ হয়ে গেছে।

মহাকবির অফুরন্ত সৃষ্টিপ্রাচুর্যের দান ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, তা জাতীয় সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জাতীয় চিত্তে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। ভবিষ্যতে তাঁর সাহিত্যের পঠনপাঠন আরও অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর হওয়ারই সম্ভাবনা। অনাগত কালের মনীষী ভাবুক রসিক সমালোচকদের নিকট রবীন্দ্র-প্রতিভার নূতন নূতন দিক উন্মোচিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর নিকট যে দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হোন না কেন, তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষের চোখে—তা সে মানুষ প্রবীণ হোন আর নবীন হোন—যেভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন সে ঘটনার বুঝি তুলনা নেই। আমরা রবীন্দ্রনাথকে কতটা বুঝতে পেরেছি বলতে

পারব না, তাঁর প্রতিভার যথাযথ পরিমাপ নিকটসান্নিধ্যে ভাবাবিষ্ট নিতান্ত সমকালীন মানুষ আমাদের দ্বারা সম্ভব কি না তা-ও অনিশ্চিত, কিন্তু এক বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমরা তাঁকে চাক্ষুষ করে তাঁর অমৃতময় বাণী থেকে সাক্ষাৎ প্রেরণা লাভের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলাম। আমরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আমলে বড় হয়েছি তাঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের সদা-সংযোগ ছিল। সেই সংযোগ আজ ষোলো বছর বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ যে কত বড় ক্ষতি, কত বড় শূন্যতা, নিজ নিজ মনকে প্রশ্ন করলেই তা বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথকে আমি নিজে যেভাবে ধরবার চেষ্টা করেছি তা পাঠকদের সামনে নিবেদন করবার চেষ্টা করব। ব্যক্তির মানসিক গঠনের দ্বারা তাঁর বোঝার দিক ও প্রকৃতি নির্ণীত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পর্যালোচনায় ও বিচারে আমার রুচি ও প্রবণতা, বলাই বাহুল্য, আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। কাজেই সে বিচার পূর্ণাঙ্গ হওয়ারও কথা নয়, পুরাপুরি নির্ভুল হওয়ারও কথা নয়। আর যাই হোক মানুষ তার স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ও মুখ্যতঃ কবি, তারপর অন্য কিছু। আমি কবিপ্রাণ নই, শুষ্ক গদ্যের কারবারী মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনায় এ ক্ষেত্রে গোড়াতেই একটা মৌলিক বিরোধ নিয়ে বিচার আরম্ভ করতে হচ্ছে। কবি ও অ-কবির পার্থক্য সুদুস্তর, আমার এমন কোন জাদুমন্ত্র জানা নেই যার বলে আমি এই অ-সেতুসম্ভব ব্যবধানের উপর সেতু নির্মাণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মরমী, অধ্যাত্মবাদী, রোমাণ্টিক, জীবনের গভীরতম অনুভূতি ও সূক্ষ্মতম ভাবের প্রকাশক, সেখানে যুক্তিবাদী অনাধ্যাত্মিক ইহমুখী এই ক্ষুদ্র লেখকের থই পাবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ভাবকল্পনাকে যতই ধরতে ছুঁতে যাই ততই তারা এই গদ্যগন্ধী লেখকের পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। অ-ধরার কবি রবীন্দ্রনাথ অ-মরমী অ-রোমাণ্টিকের নিকট আমৃত্যু আংশিক অধরা হয়েই বোধ হয় রইলেন।

তা বলে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব আমার নিকট কিছুমাত্র কম সত্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত থেকে যে কত ভাবে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছি তা বলে বোঝাতে পারব না। রবীন্দ্র-প্রভাব আমার গোটা জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল, অকবি হয়েও এ কথা বলব। কেন না রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মাত্র একটি মুখই তো ছিল না, সে প্রতিভা ছিল বহুমুখী ও বিচিত্রপথগামী। নিত্য নব ভাবের তিনি সন্ধানী ছিলেন। সব্যসাচীর মত তিনি দু'হাতে সাহিত্যের সেবা করেছেন, এবং সে সেবার ফল অজস্র ধারায় উন্মুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিচিত্র পথগামিতার জন্য রবীন্দ্রনাথ সকলেরই নিকট অধিগম্য ছিলেন। দেবদুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হয়েও এক অর্থে তিনি অন্য সবাকার চেয়ে সুলভ ছিলেন। তাঁর শক্তির প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্যের জন্যই এই সুলভতা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বহুমুখীনতার জন্য তাঁর দুয়ারে এসে কাউকে ফিরে যেতে হয় নি। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির বশে যিনি যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি সেইভাবেই তাঁকে পেয়েছেন। এমন কি রবীন্দ্র-সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করবার মত মানসিক প্রস্তুতি যাঁদের নেই তাঁদের প্রতিও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। অগণিত সংখ্যক গান আবৃত্তি নাচ অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে তিনি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন। সমসাময়িক কালের বাঙালীর নিকট রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাকবি হয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি আরও অনেক কিছু ছিলেন। জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছিল।

আমার নিকট রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি নন, শুধুই মরমিয়া সাধক নন, শুধুই অধ্যাত্মবাদী তত্ত্বজ্ঞানী নন, শুধুই অজেয় কল্পনা ও সৌন্দর্যানুভূতির অধীশ্বর নন; আমার চোখে তিনি সব চাইতে সজীব মূর্তিতে ধরা দিয়েছেন চিত্তের মুক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা রূপে। চিত্তের মুক্তির বাণী এমন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে এবং এমন অবিচ্ছেদে ভারতীয় সাহিত্যে আর কেউ প্রচার করেছেন বলে জানি না। সাহিত্যের মূল কথা হল মানব-মনের মুক্তি। ঘুমজড়ানো মনকে

জাগানোই নাকি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কাজ। অথচ এ কাজটিই তথাকথিত সাহিত্যসৃষ্টিতে সব চেয়ে কম নিষ্পন্ন হতে দেখি। সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে নানাবিধ সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার পাকে মনকে জড়ানোই যেন বাজারচলতি সাহিত্যের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য হয় ফ্যাশনেবল্ প্রগতিশীলতার কথা বলে, নয়, সংরক্ষণশীলতার পক্ষে ওকালতি করে। দুটোই কুসংস্কার এবং দুটোই সমান সন্দেহের স্থল। সত্যিকার ঔদার্য ও সংস্কারমুক্তির বাণী খুব কম লেখনীমুখেই অভিব্যক্ত হতে দেখি। এর কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। সংস্কারমুক্তির বাণী যিনি প্রচার করবেন তাঁর মনটিও সংস্কারমুক্ত হওয়া দরকার। ব্যক্তিজীবনে নানাবিধ সংস্কারের হাতে-ধরা হয়ে চলে সাহিত্যে সংস্কারমুক্তির কথা বলা যায় না। এমনতর যোগাযোগ অস্বাভাবিক বলেই অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় আমরা এর বিপরীত দেখতে পাই। ব্যক্তিজীবন এবং শিল্পজীবন উভয়তঃ তিনি সংস্কারমুক্তির সাধনা করেছেন। অন্যান্য দশজনের মত সংস্কারের হাতে-ধরা হয়েই তিনি জীবনারম্ভ করেছিলেন, কিন্তু যতই তাঁর কবিজীবনের বিকাশ হয়েছে, প্রতিভার স্ফূর্তি হয়েছে, ততই তাঁর জীবন থেকে একের পর এক সংস্কার জীর্ণ পাতার মত ঝরে গেছে। সংস্কার থেকে সংস্কারাতীতে উত্তরণ কবির সাহিত্যজীবনের একটি মূল সুর। এ বৈশিষ্ট্য তিনি লাভ করেছিলেন কতকাংশে তাঁর স্বকীয় প্রতিভা থেকে, কতক উপনিষদীয় আদর্শ থেকে, কতক বৌদ্ধ ভাবসাধনার ঐতিহ্য থেকে, কতক মধ্যযুগীয় সাধকদের জীবন ও বাণী থেকে, কতক বা আউল-বাউলপন্থী এদেশীয় সহজিয়া ভাবুকদের কাছ থেকে। পারস্যের সূফীবাদের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে কবির মানসজীবনকে পুষ্ট করেছিল। আর একটি উৎস ইউরোপের রেনেসাঁসের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। এ সমস্ত বিভিন্ন ভাবধারা একত্র মিলিত হয়ে কবির মনোজীবনকে গড়ে তুলেছিল। আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এর আগেও ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছেন, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়ে খুব কম জনাই তা প্রচার করেছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংস্কারমুক্তির আদর্শের প্রতি অনুরাগ রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা ও আচরণের ভিতর বিশেষভাবেই পাওয়া যায়, মেঘনাদবধ কাব্যের স্রষ্টা কবি মধুসূদনও ব্যক্তিস্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ছিলেন, পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে গতানুগতিকতার বিরোধী গভীর আত্মপ্রত্যয়-শীলতার সুর আমরা শুনতে পেয়েছি ; কিন্তু ভাবজীবনের সমস্ত দিক পরিবেষ্টন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চিত্তের মুক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথই প্রথম সার্থকভাবে প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মানস-শিষ্য ছিলেন । এ কথা বলা আর কবি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিলেন বলা অনেকটা সমান কথা। কেন না পশ্চিমী রেনেসাঁসের প্রভাব স্বীয়করণ ব্যতিরেকে ভারতীয় সমাজ-জীবনের পটভূমিতে রামমোহনের অভ্যুদয় কল্পনা করা যায় না। রামমোহনের 'ভুক্তি-মুক্তি'র আদর্শ মূলতঃ পশ্চিমী জীবনবাদেরই আদর্শ, শুধু তফাত এই যে এ দেশীয় ব্রহ্মবাদ দ্বারা তাকে পরিমার্জিত করে তোলা হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামমোহনেই থেমে থাকেন নি, নানা সূত্র থেকে উপকরণ আহরণ করে রামমোহনের ঐতিহ্যকে আরও অনেকগুণ সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। রামমোহন এবং অন্যান্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক জায়গায় মস্ত পার্থক্য ছিল। অন্যান্য মনীষীরা শিল্পেতর ক্ষেত্র থেকে যে সমস্যাকে বিচার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে বিচার করেছেন গভীর শিল্প ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা চিত্তের মুক্তির আবেদন সমাজ তথা শিল্পজীবন উভয়ত্র প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রজীবনেও তিনি এই নীতির সার্থক প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন। কবির বহু রচনা, বিশেষতঃ *Creative Unity*, *Personality*, *Nationalism*. *The Religion of an Artist*, *The Religion of Man*, 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি পুস্তক রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে নানাবিধ মৌলিক সমস্যার অবতারণায় পূর্ণ। তিনি ব্যক্তিকেই সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু সমাজ-নিরপেক্ষ নয়,

জাতীয়-ঐতিহ্য-নিরপেক্ষ নয়, সে কারণে ব্যক্তির বিকাশে সমাজ এবং জাতীয় ঐতিহ্যের ভূমিকা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু যেখানে সমাজের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তির মূলগত বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানে কবি দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যক্তিরই পোষকতা করেছেন। ব্যক্তিই হল কেন্দ্র। ব্যক্তির সমবায়েই সমাজের সৃষ্টি ; সমাজ বা রাষ্ট্রের অংশ ও অধীনরূপে ব্যক্তিকে দেখলে বিষয়টিকে উল্টো দিক থেকে দেখা হয়। আধুনিক মানবতন্ত্রী আদর্শের (Humanism) এইটেই হচ্ছে গোড়ার কথা, এবং এই আদর্শে কবির আস্থা অবিচল ছিল।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের এই ভূমিকাটি আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার। আমরা যখন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরাট-বিস্তৃত অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই না যিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চিত্তের মুক্তির আদর্শটিকে এমন পূর্ণ ও ফলপ্রদ ভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এক মস্ত বড় আশ্রয়, অবলম্বন। আমাদের বল ভরসা আশার স্থল। এখনকার কালের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন কোন দিক সম্পর্কে কবির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্য থাকতে পারে—থাকাটাই প্রাণের লক্ষণ—, কিন্তু যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় কোন দিনই ব্যক্তির মুক্তির আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হন নি, বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই আদর্শকে আরও সবলে আঁকড়ে ধরেছেন, তখন এই সংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন, যৌথ অত্যাচারপীড়িত অসহায় মাতৃভূমির কথা চিন্তা করে আমাদের সব ক্ষুদ্র মতানৈক্য নিরস্ত হয়ে যায়। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চাইলে আমাদের জাতীয় মানসিক সম্পদের অনেকখানিই সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে যায়। যিনি আমাদের ভাবজীবনের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ হয়ে আছেন, তাঁকে খণ্ডন করার দুশ্চেষ্টার অর্থ আলো সরিয়ে স্বেচ্ছায় অন্ধকার বরণ করে নেওয়া। এমন আত্মঘাতী মূঢ়তা যেন আমাদের কখনও পেয়ে না বসে।

রবীন্দ্রনাথ চিত্তের মুক্তির আদর্শটিকে শুধুমাত্র একটি বিমূর্ত (abstract) ভাবরূপে প্রচার করেন নি, তার কার্যকারিতার উপরও জোর দিয়েছিলেন। যেমন গোটা সমাজের অন্তর্গত স্বাধীনতার কথা তিনি বলেছেন, তেমনি সেই সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উন্নয়নের কথাও তিনি ভেবেছেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা কত অসহায় ও কত নির্মমভাবে পুরুষ-শাসিত সে কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এমন আর কেউ করেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে নারীর আত্মজাগরণের বাণী ছড়িয়ে আছে। বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা এখানে তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য, "স্ত্রীর পত্র" গল্প এবং "সরলা" কিংবা "সাধারণ মেয়ে" কবিতার উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু উদাহরণের দ্বারা অনেক কিছুরই প্রমাণ হয় আবার অনেক কিছুরই প্রমাণ হয় না। উদাহরণপঞ্জী সাজিয়ে বক্তব্য প্রতিপাদনের মামুলি অভ্যাসের উপর বেশি গুরুত্ব বোধ হয় দেওয়া চলে না। আসল কথা হচ্ছে attitude, জীবন ও জগৎকে দেখার বিশেষ ভঙ্গী। সেই attitude-এর বিচারে আমরা দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধরনটিই ছিল স্ত্রীজাতির প্রতি গভীর সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত। তিনি সমাজজীবনে স্ত্রীপুরুষের মিলিত ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেও নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদাকে কোন সময়েই তাঁর দৃষ্টিপথসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। আত্মপক্ষপাতী পুরুষের প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাবের আওতায় ভয়ভীত হয়ে বাস করা আর মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করাকে তিনি কোন মতেই স্ত্রীধর্মের চরমোৎকর্ষ বলে মেনে নিতে পারেন নি। ব্যক্তি যদি আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ একটি সত্তা হয়, তা হলে সে বিধি যেমন পুরুষের বেলায় তেমনি স্ত্রীজাতির বেলায়ও সমান প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। সে ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির সমকক্ষতা শুধুমাত্র একটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেই হল না, তার প্রতি আস্থার কার্যকরী প্রমাণও পাওয়া চাই। জীবনের নানা অবস্থা ও আচরণের মধ্যে ওই নীতির প্রতি বিশ্বাস ফুটে উঠলে তবেই ওই নীতির সার্থকতা।

নারীকে সংকটের পথে পার্শ্বে রাখতে হবে, পুরুষের দুরূহ চিন্তার অংশ ও কঠিন ব্রতের সহায় হবার অধিকার দিতে হবে, সুখে দুঃখে সহচরী করতে হবে, তবেই নারীর সত্যকার পরিচয় পাওয়া যাবে। নারীর বাহ্যরূপ তার সৌন্দর্যের সবখানি নয়, তার আন্তর শক্তির দৃপ্ত বিকাশের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারাটাই নারীর প্রতি মর্যাদাবোধের যথার্থ পরিচায়ক। নারীর এই সহজাত সুস্থ মর্যাদার জয়ঘোষণা রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য।

অন্যদিকে অবহেলিত মানুষের বেদনার কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কল্পনায় শ্রেণীবিভক্ত মানুষের চিন্তা তেমন জাগে নি, তিনি সার্বভৌম সার্বকালিক নির্বিশেষ মানুষের মহিমাই প্রধানতঃ ঘোষণা করেছেন তাঁর কাব্যে। এই নিয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল, তারও তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না প্রথম দিককার কবিতায়—একমাত্র "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি এ কথার ব্যতিক্রম—, কিন্তু যতই জীবন-সাধনার পথ বেয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন ততই তিনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অধঃপতিত অনাদৃত মানুষগুলির সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। রাষ্ট্র ও সমাজের পশ্চাদ্‌ভাগে অবহেলায় নিক্ষিপ্ত অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে কবির পক্ষে বেশি দিন উদাসীন হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। টলস্টয়ের মত তিনি যে অবহেলা আর অনাদরের মানুষগুলির জীবনের স্তরে নেমে এসে তাদের সুখদুঃখের শরিক হতে পেরেছিলেন তা নয়, সে চেষ্টাও তিনি করেন নি, তবে তাঁর মানবতাবাদী প্রত্যয় এই পথে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় যে সমাজতন্ত্রী বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, তাঁর মানবতাবাদই তাঁকে অনতিক্রম্য নিয়তির মত সেখানে টেনে নিয়ে এসেছিল। জীবন ও জগতের এত বৈচিত্র্য কল্পনায় স্পর্শ করবার সৌভাগ্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয় নি বলে কবির যে আক্ষেপ, সে বেদনার দীক্ষা তিনি মানবতন্ত্রী প্রত্যয় থেকেই লাভ করেছিলেন।

নির্যাতিত মানুষ শুধু দেহের নির্যাতনই ভোগ করে না, মনের নির্যাতনও ভোগ করে। বুদ্ধির জড়তা শেষোক্ত নির্যাতনের অন্যতর পরিণামফল। আমাদের সমাজের অগণিত অবহেলিত মানুষের বুদ্ধির ভীরুতায় কবি শঙ্কিত হয়েছিলেন। বুদ্ধি-অচেতন হয়ে সব রকমের অত্যাচারকে নির্বিবাদে সহ্য করার নিয়তিকে তিনি কোন সময়েই পুরুষার্থ বলে ভাবতে পারেন নি। তাই তো বুদ্ধির ভীরুতার বিরুদ্ধে মানুষের আত্মসম্বিৎ ফেরাবার জন্য সাহিত্যে ও জীবনে কবির সীমাহীন প্রয়াস, আর এই প্রয়াসেরই অঙ্গরূপে কবি শোষিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি দৃকপাত করা কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। যদিও কাব্যজীবনের একটি বিস্তৃত অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই কবিচেতনার এই পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটেছে, তবে তার জন্য আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ নেই। কেন না শেষ-ভালতেই গোড়ার সব অপূর্ণতার শোধন হয়ে গেছে। কবির মানসিক জীবনের বিবর্তন ও উদ্বর্তন যে সুধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে ওই বাঞ্ছিত পরিণামের দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল রবীন্দ্র-ভাবপরম্পরা অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়। যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চিত্তের মুক্তি কবির এত প্রিয়, সেই সুন্দর আদর্শই অলঙ্ঘনীয় একটি উপসংহারের মত তাঁকে সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়ের এলাকায় হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এ পরিণাম অতিক্রমণের ক্ষমতা কবির ছিল না, কেন না সে ক্ষেত্রে নিজের বিশ্বাসের প্রতিই কবির অসত্যাচরণ করতে হয়, যা রবীন্দ্রনাথের মত সত্যান্বেষী মানুষের পক্ষে অভাবনীয়। সত্যের প্রতি যাঁর চক্ষু সততনিবদ্ধ তাঁর মত পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি দেখা যায় না। প্রয়োজন হলে তিনি পূর্ব-লালিত দীর্ঘকালীন বিশ্বাসকে মমতাহীন চিত্তে এক মুহূর্তেই ছেদন করতে পারেন।

সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি ধারণার খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করেন নি, তার সমস্ত রকম তাৎপর্য, সম্ভাব্যতা ও পরিণামফল পর্যালোচনা করে দেখেন নি, কিন্তু যা রাজনীতিক, অর্থনীতিক বা সমাজতাত্ত্বিকের নিকট প্রত্যাশিত তেমন দাবি আমরা কবির নিকট

কেনই বা করব? কবি যে সব কিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে স্থাপন করেছেন, ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত করেছেন, সকল শ্রেণীর শৃঙ্খলিত মানবের মুক্তির গান গেয়েছেন—সেইটেই কি তাঁর কাছ থেকে আমাদের যথেষ্ট পাওয়া নয়? আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য দু হাতে বিলোনোর উপরে এই দিক দিয়েও যা দিয়েছেন তারও কোন তুলনা নেই। তিনি শুধু আমাদের হৃদয়ের খোরাক জুগিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, আমাদের মনকেও বার বার সবেগে নাড়া দিয়েছেন। মুক্ত বুদ্ধির উদ্বোধনের জন্য কবির বিরামবিহীন লেখনী সঞ্চালনের চেষ্টার ভিতর একটা বড় রকমের গৌরব নিহিত আছে। হৃদয়বত্তা ও মননশীলতা, রস ও জ্ঞান—এই উভয় দিক দিয়েই কবির স্বদেশসেবার গৌরবের তুলনা হয় না।

'চিত্তের মুক্তি' কথাটা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। ওটি নিছক ধরতাই বুলি নয়, ওর পিছনে একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় সজ্ঞানে এই জীবনদর্শন প্রচার করেছেন। আমরা গড়পরতা সাধারণ মানুষ নানাবিধ সংস্কারের হাতে-ধরা হয়ে চলতে ভালবাসি। আমাদের মানসিক আলস্যই এর কারণ। স্বীয় বুদ্ধিকে আমরা পারতপক্ষে খাটাতে চাই না। তৈরী জিনিসের মত তৈরী ধ্যান-ধারণার প্রতিই আমাদের সমধিক লোভ। এ জাতীয় তৈরী বস্তু আমরা নানা সূত্রে পাই। কখনও পুরাতন শাস্ত্রকার, কখনও স্মৃতি কিংবা সংহিতাকার, কখনও গ্রামবৃদ্ধ, কখনও পিতামাতা বা তৎস্থানীয় মাননীয় ব্যক্তি, কখনও গভর্নমেণ্ট, কখনও বিশেষ উদ্দেশ্যে চালিত গোষ্ঠী, কখনও collectivism-এর নীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক সংস্থা—নানা ছদ্মবেশে কর্তৃত্বস্পৃহা আমাদের বুদ্ধিকে কবলিত করতে চেষ্টা করে। বুদ্ধির এই বিভ্রান্তিরও আবার নানা প্রকারভেদ আছে। কখনও বুদ্ধি বিচারহীন অতীত গৌরবের মোহের নিকট আত্মসমর্পণ করে, কখনও ভ্রান্ত দেশাচার বা অর্থহীন প্রথার গলায় তা মালা পরিয়ে দেয়, কখনও সংকীর্ণ জাতীয়তা বা ঐতিহ্যপ্রীতির যূপকাষ্ঠে তা বলিপ্রদত্ত হয়, কখনও বা আধুনিক কালের Totalitarian অপ-দর্শনকে মুক্তির উপায়জ্ঞানে বিমূঢ়ের ন্যায়

আঁকড়ে ধরা হয়। এই সব অশুভ পরিণামের নিরাকরণের একমাত্র উপায় ব্যক্তির জাগরণ। বুদ্ধির উজ্জীবন। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য অনেক গৌরবজনক কাজের সহিত এই কাজটিও গভীর নিষ্ঠাভরে করে গিয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই কাজ রবীন্দ্রজীবনে একটি ব্রতস্বরূপ ছিল। খণ্ড কোন একটি অধ্যায়ের চেষ্টায় নয়, সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে কবি এই ব্রতের উদ্‌যাপন করে গেছেন। গোড়াকার দিকে হয়তো এই ব্রতচেতনা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, দু'চারটি গতানুগতিক সংস্কারের খাদের সঙ্গে জড়িয়েমিশিয়ে ছিল, কিন্তু যতই দিন গেছে ততই সে চেতনা তার স্বকীয় উজ্জ্বলতায় স্বর্ণলেখার ন্যায় ফুটে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, যে যার প্রবণতা অনুযায়ী সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হয়। আমার নিকট রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বিশেষ দিক বরাবরই অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। সমাজে ব্যক্তি-মর্যাদার অপহ্নবকারী নানাবিধ দুষ্ট শক্তির প্রাবল্যের জন্য এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হওয়া ছাড়া বোধ হয় কোন বুদ্ধিজীবীরই নিস্তার নেই। এ দেশে নিরুপায় বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে তার এই বিশেষ দিকটির হিসাব না নিলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অত্যন্ত সংকুচিত করে দেখা হয়। চিত্তের মুক্তির আদর্শে যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁরা তেমন ভুল করতে পারেন না।

রবীন্দ্রসাধনার স্বরূপ

১

আজকাল পত্র-পত্রিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে প্রায়ই একটি নূতন বিশেষণের সাক্ষাৎ পাচ্ছি : তিনি 'জাতীয়' কবি (national poet) ছিলেন। এই 'জাতীয় কবি' কথার অর্থ কী, রবীন্দ্রনাথের বেলায় অভিধাটি প্রযোজ্য কি না, প্রযোজ্য হলে রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা কোন্ বিশেষ তাৎপর্যের বাহক—এ সমস্ত প্রশ্ন স্বতঃই এ স্থলে উদিত হতে পারে। প্রশ্নগুলি পরীক্ষার যোগ্য সন্দেহ নেই।

আমরা জানি শেক্স্পীয়রকে ইংলণ্ডের জাতীয় কবি বলা হয়। শেক্স্পীয়রের বেলায় এই বিশেষণের তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, তাঁর ভিতর ইংলণ্ডের জাতীয় কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সংসাধিত হয়েছে, কাজেই ইংলণ্ডের সমগ্র কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যদি কারও উপর অর্পণ করতে হয় তো সে সম্মান ন্যায্যতঃ শেক্স্পীয়রের প্রাপ্য আর 'জাতীয় কবি' বিভূষণই বোধ করি এ সম্মান প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। অথবা এমনও হতে পারে, শেক্স্পীয়রের কোন কোন নাটকে (যথা 'রাজা হেনরি'-বর্গীয় নাটকগুলিতে) ইংলণ্ডের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভীপ্সা, আত্মচেতনা এমন প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, ইংরেজ সমালোচকেরা শেক্স্পীয়রকে জাতীয় কবি আখ্যা দিয়ে সকল লক্ষণের উপর তাঁর দেশহিতৈষণাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। শেষোক্ত মানদণ্ডের বিচারে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি বলা যায় কি না সন্দেহ, যদিও এ কথা বিশেষভাবেই স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের দেশহিতৈষণায় কখনও কোন খাদ ছিল না। অন্ততঃ যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ আর যা-ই হোন nationalist poet ছিলেন না। অন্ততঃ যে অর্থে 'nationalist' কথাটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে অর্থে যে নন, এটি জোর করেই বলা যেতে পারে। পরে এই মন্তব্যটি আরও বিস্তারিত করবার

অবকাশ হবে, আপাততঃ এইমাত্র বলি যে, 'জাতীয়তাবাদী কবি' আর 'জাতীয় কবি' কথা দুটি এক নয়। রবীন্দ্রনাথের বেলায় 'জাতীয় কবি' অভিধার যৌক্তিকতা মানতে গেলে অভিধাটিকে জাতীয়তাবাদের অপেক্ষা অনেক বিশাল ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মনে হয় সম্প্রতি যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করে এই আখ্যায় ভূষিত করছেন তাঁদের অভিপ্রায়ও তা-ই—রবীন্দ্রকাব্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের বিশেষ সাধনার বাণীটি সার্থকতম অভিব্যক্তির ভাষা পেয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, অপিচ তাঁর কাব্যসমৃদ্ধির দ্বারা জগৎসভায় ভারতের মান বর্ধন করেছেন। কিন্তু শুদ্ধমাত্র এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি আখ্যা দিলে তাঁর কবি-প্রতিভাকে বোধ হয় অনেকখানি সংকুচিত করে দেখা হয়।

২

ভারতবর্ষের বিশেষ সাধনার বাণী কী এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতর তা কী ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, ভারতীয় সাধনার মূল কথা হল সমন্বয়, বিভেদের মধ্যে ঐক্য; এই সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী রবীন্দ্র-চিন্তায়, দর্শনে, কাব্যে ও জীবনে যেরূপ সুষ্ঠু ও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে এমন আর কোন ভারতীয় কবির রচনায় করে নি। বস্তুতঃ, সমন্বয়ই হল রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণ। এই সমন্বয় নূতনের সঙ্গে পুরাতনের, সংসারচেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার, ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, গভীর সৌন্দর্যস্পৃহার সঙ্গে গভীর নীতিজ্ঞানের, প্রেমের সঙ্গে মানবপ্রীতির সমন্বয়। কবি তাঁর বিচিত্র রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একটি মৌলিক ভাবাদর্শ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, ওটি মৌলিক বাণী নয়, কোন একটি মৌলিক বাণীর আনুষঙ্গিক বাণী মাত্র। বিশেষ ভাবে ভারতীয় সমন্বয়ের আদর্শের উৎস থেকেই তিনি তাঁর শেষোক্ত ভাবের প্রেরণা সংগ্রহ

করেছিলেন। আমাদের ভারতীয় জীবনের পরিসরের ভিতর ভোগ ও ত্যাগের মিলন বলতে যা বোঝায়, কর্মিষ্ঠতা আর ভাবুকতার সমন্বয় বলতে যে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সেইটেই পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ভাবের মিলনের বাণীরূপে কীর্তিত ও প্রচারিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে কর্মাদর্শের জয়জয়কার, অন্যপক্ষে প্রাচ্যে ভাবুকতার প্রাধান্য। কবি যখনই এই দুটি ভাবের মিলনের তত্ত্ব প্রচার করেছেন তখন যেমন একদিকে পূর্ব ও পশ্চিমকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ওই সম্পর্কবন্ধনের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের আদর্শটিকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বস্তরে সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। কি চিন্তায়, কি বিশ্বাসে, কি আচরণে বিভিন্ন বিরোধী বৃত্তিনিচয়ের ভিতর সামঞ্জস্য বিধানের দুরূহ প্রয়াসটিকেই তিনি তাঁর জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি, এ দুরূহ আদর্শের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলগত ভাবটি থেকে। এই মূলগত ভাব, বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা আবিষ্কার করেন এবং দেশবাসীর সমক্ষে তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রচার করেন। Vincent Smith প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে unity in diversity-র কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁদের সে বলা নিতান্তই গদ্যপ্রাণ ঐতিহাসিকের বলা; তার ভিতর কবিসুলভ দিব্যদৃষ্টির পোষকতা ছিল না। ঐতিহাসিক আর কবির মেজাজের ভিতর বড় তফাত এইখানে যে, ঐতিহাসিক যেখানে বিচিত্র তথ্যের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, কবি সেখানে তাঁর যষ্ঠেন্দ্রিয় (sixth sense)-প্রসূত দিব্যজ্ঞান প্রয়োগ করে ঐতিহাসিকের চাইতেও অবলীলাক্রমে বস্তু বা বিষয়ের ভিতরের কথাটি টেনে বার করেন। এবং কবিদ্রষ্টার সে সিদ্ধান্ত যে ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণযোগ্য হয় এমন মনে করবার হেতু নেই। বরং কবির কথায় ঐতিহাসিকের সকল বক্তব্যের সার অনেক বেশী মনোজ্ঞ ভাষায়, অনেক বেশী ফলপ্রদ ভাবে প্রায়শঃ রূপায়িত হতে দেখা যায়। কবি তাঁর কল্পনাশক্তির প্রভাবে

ঐতিহাসিকের তাবৎ কথার নির্যাস অবলীলায় নিষ্কাষণ করে আনেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দিব্যদৃষ্টির খেলা যে কথার কথা মাত্র নয় তা যাঁরা তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' এবং তার ইংরেজী ভাবানুবাদ *A Vision of India's History* পড়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে পর পর কতকগুলি নিবন্ধ প্রচার করেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" ছাড়াও এই সময় তিনি সমধর্মী আর যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন তার ভিতর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা", "ভারতবর্ষের ইতিহাস", 'স্বদেশী সমাজ", "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সনে মান্দ্রাজের আডিয়ারে প্রদত্ত *The Centre of Indian Culture* বক্তৃতাটিকেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এ ছাড়া ভারতীয় সাধনার এই সমন্বয়ী প্রতিভার কথা তিনি তাঁর একাধিক কবিতায়ও ব্যক্ত করেছেন। যে সকল কবিতা এই ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার মধ্যে "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" কবিতাটিকে সব চাইতে প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলা যেতে পারে।

এ সমস্ত রচনার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়েই কবি তাঁর সেই এক সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন: "বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।" "ঐক্য-সাধনাই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ" ("স্বদেশী সমাজ")। আমরা ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে কবির এই মৌলিক বক্তব্যটি আরও একটু বিস্তৃত ভাবে এখানে তুলে ধরছি: "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা" ("ভারতবর্ষের ইতিহাস", 'স্বদেশ') অথবা: "বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে

চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা” (“ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা”, ‘পরিচয়’)।

এই যে বিভেদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়াস, যাকে কবি ভারতবর্ষের মূল সাধনা বলে অভিহিত করেছেন, তাকে তিনি শুদ্ধমাত্র বিশ্বাসের সীমাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তদনুযায়ী স্বীয় ভাবজীবনকেও আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার যে মূল প্রকৃতির সন্ধান তিনি পেলেন, স্বীয় কবিপ্রকৃতিকে তিনি তার অনুগত করেছিলেন। কিন্তু এমনও হতে পারে, কবির স্বভাবের ভিতর সমন্বয়ের যে সহজ প্রবণতা ও প্রতিভা ছিল, ভারতের অতীত সভ্যতার ধারার ভিতর তার সমর্থন খুঁজে পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই অত্যন্ত উৎসাহভরে সে আদর্শের প্রচার করেছিলেন। সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেও বলা যায়, কবি একই কালে সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার ও অনুসরণ করেছেন। কি তাঁর কাব্যপ্রতিভা, কি তাঁর দর্শনচিন্তা, কি তাঁর কর্মপ্রয়াস সর্বত্র তিনি ভারতীয় সাধনার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে মূর্ত করে তুলতে চেষ্টিত ছিলেন। এবং সে চেষ্টায় তিনি পরিপূর্ণ সফলকামও হয়েছিলেন।

যদি অ-ভারতীয় কেউ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাহিত্য ও অন্যান্য রচনাদি মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং সেই ব্যক্তির ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে অগ্রিম পরিচয় থাকে, তা হলে তিনি একটি জিনিস লক্ষ্য করে বিমুগ্ধ হবেন। সেটি হচ্ছে, কবিব্যাখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে কবির কাব্যের ও চিন্তাসাহিত্যের সমপ্রাণতা। ভারতীয় ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ঐক্যচিন্তা আর কবির কল্পনা যেন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। বৈদিক যুগের ভারতবর্ষ, রামায়ণ-মহাভারতের ভারতবর্ষ, বৌদ্ধ ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষ, এবং আধুনিক কালের ভারতবর্ষ—ভারতীয় ইতিহাসের প্রায় সব কটি স্তরই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কেবল ভারতীয় ইতিহাসের একটি স্তরকে তিনি স্বীকার করেন নি। সেটি হচ্ছে সেই যুগ, যখন বৌদ্ধযুগের বিলয়ের সমাধির উপর নব-হিন্দুত্ব তার অতিমাত্রিক সংরক্ষণশীলতা ও

আচারনিষ্ঠা নিয়ে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সকলপ্রকার পরিবর্তনপ্রয়াসের উপর আক্রমণাত্মক মনোভাব উদ্যত রেখে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে। এই যুগে মনুসংহিতার জন্ম; হিন্দুসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তোলার অন্যান্য আয়োজনেরও সূচনা এই যুগে। সর্বপ্রকার গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও কুরুচির তীব্র বিরোধী রবীন্দ্রনাথ এই অসহিষ্ণু যুগটিকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বৌদ্ধযুগের অবসানের অধ্যায়ে লুপ্তাবশিষ্ট বৌদ্ধদের নানারকম বিকৃতাচার যেমন কবির কল্পনাকে পীড়িত করেছে তেমনি সদ্যজাগ্রত ষোল-আনা হিন্দুয়ানির মনোভাবও কবিকে সমপরিমাণে বিমুখ করেছে। বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের ওই বিনাশের ছিদ্রপথেই ভারতে মুসলমান শক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়ায় নব-হিন্দুত্বের সংরক্ষণশীল মনোভাব আরও বেশী বেড়ে গিয়েছিল এবং হিন্দু সমাজের চারদিকে শক্ত করে বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

এই ভাবে কৃত্রিম নিয়মবিধির রক্তচক্ষু শাসানির দ্বারা হিন্দু সমাজকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখবার প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চললে হিন্দু সমাজের কী গতি হত বলা কঠিন। কিন্তু আশার কথা, ভারতীয় ইতিহাসের ভাবগগনে এই সময়ে এমন কতকগুলি জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হয়েছিল যাদের বিচ্ছুরিত আলোকের প্রদীপ্তিতে ভারতীয় ইতিহাস এক নূতন প্রভায় প্রভাময় হয়ে উঠল। ভারতীয় ভাবাকাশের এইসব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মধ্যযুগীয় সাধক নামে পরিচিত। নানক, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ, সুরদাস, চৈতন্যদেব এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের উপর এইসব মধ্যযুগীয় সাধকের প্রভাব অসীম। মধ্যযুগীয় সাধকমাত্রেই ছিলেন সমন্বয়ের সাধক। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী তাঁদের সকলেরই সাধনার একেবারে গোড়ার কথা; কাজেই তাঁদের সাধনা ও দৃষ্টান্ত যে কবিকল্পনাকে বিশেষ ভাবে উচ্চকিত করবে সেটি সহজেই অনুমান করা চলে। অন্যপক্ষে, আধুনিক যুগের প্রান্তে এসে, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গী কবিকল্পনাকে

অনুপ্রাণিত করেছিল। রামমোহনের ভিতর ভোগী ও ত্যাগী, গৃহী ও ব্রহ্মনিষ্ঠের যে সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল, তা পুরাকালীন রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। আর রাজর্ষি জনকের জীবনাদর্শ যে কবির বিশেষ প্রিয় ছিল তা তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পড়লেই বোঝা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা ওই একই আদর্শের অনুবর্তী ছিল।

এ তো গেল সাধারণ সূত্রের বিবৃতি। যদি কেউ ভারতীয় ইতিহাস আর কবির কাব্যসাধনার সমপ্রাণতার আশু এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ চান, তাঁকে আমরা বিশেষ করে কবির প্রথম চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্যসাধনার সমৃদ্ধ দানের সঙ্গে পরিচিত হতে অনুরোধ করব। যে কেউ কবির 'সোনার তরী', 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্য, কবির বিপুল সংখ্যক গান, সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য, 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছের গল্প এবং রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রবন্ধসাহিত্যের ভাণ্ডার নেড়ে-চেড়ে দেখবেন, তিনি অচিরেই আকাঙ্ক্ষিত প্রমাণ পেয়ে যাবেন। এই ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ বিশেষ নজীর উদ্ধার করে দেখাবার প্রয়োজন হবে না, কেন না রবীন্দ্রসাহিত্য আগাগোড়াই এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিবেশের ভিতর ভারতীয় ইতিহাসের এই মূল চেতনাটি জড়িয়ে-মিশিয়ে আছে। যেখানে সাহিত্যসাধনার সমগ্র ফলটাই একটা বিশেষ ভাবের দ্বারা বিধৃত, সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে নজীর খুঁজতে যাওয়ার সার্থকতা স্বতঃসিদ্ধ নয়। তবু, কোন কোন বিশেষ গ্রন্থের এই দিক দিয়ে সমধিক উপযোগিতা থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে 'নৈবেদ্য', 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্য, 'গীতাঞ্জলি'র গান, 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ, পূর্বোক্ত দুটি ইংরেজী পুস্তিকা এবং *Nationalism*, *Sadhana* প্রভৃতি গ্রন্থ, 'গোরা' উপন্যাস এবং 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী' প্রমুখ একাধিক নাটকের নাম করতে পারি। আর এ কথার দৃষ্টিগ্রাহ্য, স্থূল প্রমাণ যদি চাওয়া হয় তা হলে সে প্রমাণের জন্যও আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না, হাতের কাছেই সেটি

জলজ্যান্ত খাড়া আছে—শান্তিনিকেতন। কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত সমন্বয়ী সাধনার প্রতীক স্বরূপ। শান্তিনিকেতনে কী পরিমাণ ও কতটুকু কাজ হয়েছে তা দিয়ে আমরা বিষয়টির বিচার করব না, বিচার করতে হবে কবির অভিপ্রায়, আর সেই মানদণ্ডে কবির ধ্যানের ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার রূপটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনযাত্রায় ফুটিয়ে তোলবার সযত্ন চেষ্টা হয়েছে সে কথা মানতেই হয়। কবিপ্রচারিত আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শও এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সুতরাং যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন-পরিকল্পনার ভিতর বিশ্বভারতীর গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। বিশ্বভারতীর কর্মপ্রয়াসের ভিতর আমাদের সকল প্রত্যাশার পূরণ না হতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে কোন ক্রমেই উদাসীন হওয়া চলে না। বিশ্বভারতীকে বাদ দিলে রবীন্দ্রসাধনার পূরাপূরি তাৎপর্য গ্রহণে বাধা ঘটে, এ কথা স্বীকার করা ভাল।

৩

আমরা পূর্বেই বলেছি, জাতীয়তাবাদ কথাটা সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার আদর্শ কবির কল্পনাকে আকর্ষণ করে নি। সত্য বটে কবির দেশপ্রেমমূলক বহু গান আছে। কবিরই অন্যতম গান "জনগণমন" আজ জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় সমাসীন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কবি তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ওই সময়েও তিনি জাতীয়তাকে একটা ব্যাপক, উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতের মিল ছিল সামান্যই, ক্রমশঃ এই পার্থক্য স্ফুটতর হয়। অবশেষে এমন একটা সময় আসে যখন তিনি জাতীয়তাবাদীদের

সঙ্গে প্রকাশ্যতঃ ছেদ ঘটাতে বাধ্য হন এবং জাতীয়তাবাদের স্থলে উদার আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে আঁকড়ে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের সমন্বয়ী প্রবণতা আন্তর্জাতিক আদর্শের ঘোষণায় ও অনুধ্যানে সমধিক স্ফূর্তি লাভ করে। ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করে কবি রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের আদর্শকে কর্মপ্রয়াসের ভিতর বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের ঘোষণায় আন্তর্জাতিক মৈত্রীস্থাপন প্রচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে স্বীকার করা হয়। তার পর থেকে কবি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি তাঁর এই একমনস্ক অভিনিবেশের দরুন কবি শেষ বয়সে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শে অবিচল ছিলেন।

এইখানে বিষয়টিকে আরও একটু কাছে থেকে পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এমন নয় যে জাতীয়তাবাদ বস্তুটির স্বপক্ষে ভাল কথা বলবার কিছু নেই বা তার সার্থকতা নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক অর্থাৎ পরশাসিত দেশমাত্রেই জাতীয়তাবাদ একটি অপরিহার্য অধ্যায় এবং সে অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে দেশবাসীকে যেতেই হবে। ভারতবর্ষে মাত্র কিছুদিন আগেও এমনতর অবস্থা বিদ্যমান ছিল, কাজেই এ দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের আবশ্যিক অধ্যায়টিকে কোনক্রমেই খাট করে দেখা চলে না। রবীন্দ্রনাথ খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, সুতরাং নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ কথাও সুবিদিত যে, স্বদেশী আমলে তিনি দেশের জন্য হাতেকলমে অনেক কাজ করেছেন। অপরে অন্যান্য ভাবে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তিনি সে স্থলে অগণন স্বদেশী সঙ্গীত রচনা ও স্বদেশী আদর্শের প্রচার করে জাতির মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও তিনি কম দেন নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই জাতীয়তাবাদের অন্য একটি রূপ

তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তিনি দেখলেন, নির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসরের ভিতর জাতীয়তাবাদ ভাল, কিন্তু তাকে যদি সর্বগ্রাসী করে তোলা যায় তা হলে তা উগ্রতা, একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা-মণ্ডিত হয়ে বিপত্তির চরম ঘটায়। আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের তখন শৈশবাবস্থা, কাজেই তিনি যে সব কিছু অবস্থা শেষ অবধি প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এমন মনে করলে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি অবিচার করা হবে। বস্তুতঃ তিনি সম্ভাবনাটি অনুমান করেছিলেন মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। এই অনুমান-প্রক্রিয়ায় ইউরোপের দৃষ্টান্ত তাঁকে অনেকখানি প্রভাবিত করে থাকবে। ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের চেহারা দেখে ক্রমেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার নগ্ন রূপ দেখার পর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মনে যেটুকু বা মোহ ছিল তা-ও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তারপর থেকে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সঙ্গে রফা করে চলবার আর কোন কারণ তিনি খুঁজে পান নি। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার আদর্শের প্রতি তিনি কী পরিমাণ খড়্গহস্ত ছিলেন তাঁর *Nationalism* গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত "ভারতে জাতীয়তাবাদ" নামক নিবন্ধের (যা আমেরিকায় বক্তৃতা আকারে প্রদত্ত হয়েছিল) এক জায়গায় আছে : "Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom of India's troubles." অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ একটা মস্ত দুর্দৈব। বহু বৎসর যাবৎ এই বস্তুটিই ভারতের সকল দুঃখদুর্দশার মূল কারণ। এ থেকে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কবির অনমনীয় মনোভাব বোঝা যেতে পারে।

কাজেই 'জাতীয়তাবাদী কবি' অর্থে 'জাতীয় কবি' অভিধাটির প্রয়োগ করলে কবির কাব্যসাধনার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ কোন কালেই ছিলেন না, শেষ বয়সে তো একেবারেই নন। তবে যদি ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত মূল ভাবের শ্রেষ্ঠ

প্রকাশ রূপে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যকে ব্যাপকতম সংজ্ঞার্থে জাতীয়তাবাদী সাহিত্য বলা হয়, তবে তার একটা মানে হতে পারে বটে। কিন্তু সেখানেও পদে পদে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কবি নিজের দেশ, নিজের বাসভূমি, নিজের ধর্ম, নিজের ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অন্তরের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে গেছেন। এজন্য অপর দেশের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে খাট করে দেখাবার আদৌ প্রয়োজন হয় নি। বরং অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থায়, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে যা-কিছু সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ, তাকেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সৌষ্ঠববর্ধনে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। যেখানে যতটুকু ভাল উপকরণ পাওয়া সম্ভব কোনটাই তাঁর সাধনায় অগ্রহণীয় ছিল না—প্রাচীন ভারতের আদর্শের বুনিয়াদের উপর আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ সৌধ নির্মাণে তিনি হাজারো রকমের মালমসলা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সমন্বয়ীপ্রতিভাদীপ্ত সব্যসাচী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। সমন্বয় যাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনের মূল কথা, তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে উপকরণ আহরণ করবার কথা না বললেই বরং আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে যেত।

৪

অনেকে সমন্বয়ের সাধনাকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করতে চান এই যুক্তিতে যে, ওটা আসলে গোঁজামিলের সাধনা, এর মধ্যে প্রকৃত মনোভাবের পরিচয়, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়। সমন্বয়-প্রয়াসের নামে সমন্বয়বাদীরা সাধারণতঃ যে জিনিস আচরণ করেন তা হচ্ছে সংস্কারমূলক তৎপরতা—বিভিন্ন বিরোধী ভাবের ভিতর জোড়াতালিমূলক রফাকেই বলে সমন্বয়। অর্থাৎ প্রগতিবাদীদের মতে সমন্বয় হচ্ছে reformist zeal-এর ফল, তাকে revolutionary আখ্যায় কদাপি আখ্যাত করা চলে না।

যুক্তিটিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেন না জীবনের নানা ক্ষেত্রে সত্যই তো দেখা যায়, জোড়াতালি আর গোঁজামিল আর দুর্বল আপোসের মনোভাব কত সময় সমন্বয়ের ছদ্মবেশে "খাঁটি জিনিস" হিসাবে পার পেয়ে যায়। বিপ্লবকে যেখানে গ্রহণ করতে লোকে ভয় পায় সেখানেই নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আপোসের কথা ওঠে। কিন্তু বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ আপোসকামী মনোভাবের বশে সমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করেন নি। তিনি হয়তো সংজ্ঞার্থে বিপ্লবী ছিলেন না, তাই বলে তিনি সংস্কারপন্থীও ছিলেন না। তাঁর সমন্বয়ী সাধনার ভিতর বলিষ্ঠতা প্রচুর ছিল। দীর্ঘ দিনের নির্বিচার অভ্যাসে ভারতীয় জীবনে যে সকল কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের বিরুদ্ধে কবির মনোভাব প্রকৃতই অনমনীয় ছিল। তিনি ভারতবাসীর জীবন থেকে "আচারের মরু বালিরাশি" ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর তৎপরতায় কখনও শৈথিল্য ঘটে নি। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাসের সুবিশাল উপকরণের ভাণ্ডার থেকে সেই সকল উপকরণমাত্র স্বীয় আদর্শসিদ্ধির জন্য গ্রহণ করেছেন, যা একত্র সমন্বিত করে তুলতে কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের ভিতর সামঞ্জস্য-বিধান যেমন দুরূহ ব্যাপার, তেমনি সমষ্টিগত জীবনে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন তার চেয়ে কিছু কম দুরূহ কাজ নয়। চূড়ান্ত মত বা আদর্শের অনুবর্তী হয়ে চলা বরং সোজা, কিন্তু বিভিন্ন চূড়ান্ত মতের মধ্যবর্তী যে সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম, তাকে অতিক্রম করার কাজটি তত সোজা নয়। অনেক সময়ই এই মধ্যপথে চলা ধারালো তরবারির প্রান্তের উপর দিয়ে চলার মতই কঠিন। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিনের সাধনাকেই তাঁর জীবনের সাধনা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

আরও একটি ব্যাপার থেকে রবীন্দ্রসাধনার স্বয়ংবৃত দুরূহতা অনুমিত হয়। "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর্য-অনার্যের প্রবল বিরোধ-জনিত ব্যাপক আলোড়নকে ভারতীয় ইতিহাসের আরম্ভ-যুগের

একটি প্রধান লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। এবং এই আলোড়নের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে মর্মগত অত্যাশ্চর্য সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা-ও তিনি নির্দেশ করেছেন। এইরূপ সংঘটনের কারণ স্বরূপে কবি বলতে চান যে, যেখানে দুই পক্ষই অল্পবিস্তর সমান শক্তিসম্পন্ন সেখানে প্রবল বিরোধের মধ্যেও দুই পক্ষের মধ্যে এক প্রকার শ্রদ্ধার ভাব থাকে। "মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।" ('পরিচয়')

এটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের আত্মপ্রসারণের দিনের কথা। তার আত্মসঙ্কোচনের দিনে আর একবার অনার্যবিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু "অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই, তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এই জন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সঙ্কোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনরূপ অধিকার দাবী করে না। এইরূপ যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে।" (সমগ্রন্থ)

কবির বক্তব্যের ভিতরের কথা সম্ভবতঃ এই যে, দুই সমান বলসম্পন্ন বিরোধীশক্তিযোগেই একমাত্র উন্নততর পরিবর্তনের অবস্থা ঘটানো চলে এবং সেইটেই হল যথার্থ সমন্বয়। যেখানে এক পক্ষ প্রবল অন্য পক্ষ দুর্বল, সেখানে

দুই শক্তির মধ্যে সমন্বয় চলতে পারে না। এক পক্ষের অবদমনের উপরেই সেখানে অন্য পক্ষের প্রতিষ্ঠা।

এই দিক দিয়ে কবির পরিপোষিত সমন্বয় অবশ্যই সংস্কারপন্থীসুলভ সমন্বয় নয়। এই সমন্বয়ের অন্তরে অনেকখানি জোর আছে; আর এই সমন্বয়ের নীতি বাস্তব জীবনে সর্বভাবে প্রয়োগ করলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনেকখানি। ভারতীয় ইতিহাসের যে ঐক্যসাধনার উপর কবি জোর দিয়েছেন তা আসলে বহু বিরোধী শক্তির যোগে মৌলিক পরিবর্তনসূচক উচ্চতর অবস্থা সৃষ্টির সাধনা। একপেশে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে একে হয়তো বিপ্লবী সাধনা বলা চলবে না, কিন্তু এটি যে কঠিনের সাধনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৫

এবার ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ভারতের ভবিষ্যৎ জীবন রবীন্দ্রসাধনার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হওয়া সম্ভব? আমাদের পক্ষে আগামী বহুকালের জন্য সমন্বয়পন্থাই গ্রাহ্য, না, বিপ্লবের আগুনে সমাজজীবনকে পুড়ে তছনছ করে তার চিতাভস্মের উপর নূতন সমাজব্যবস্থা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার মধ্যেই আমাদের যথার্থ মুক্তি নিহিত?

এ সম্পর্কে ভিন্ন জন ভিন্ন কথা বলবেন। তবে বিপ্লবের যৌক্তিকতা অস্বীকার না করেও বলা যায়, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত সমন্বয়ের পথে দেশকে চালনা করলে দেশের পক্ষে তার ফল বিপ্লবপ্রয়াসের ফলের চাইতে কিছু কম দূরপ্রসারী হবে না। "যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উন্মত", সেই অভিপ্রায় রবীন্দ্রসাধনার ভিতর সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত এবং ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে সেই অভিপ্রায়কে যদি রূপ দেওয়া যায় তবে দেশের চেহারা অচিরেই বদলে ফেলা যেতে পারে। এখন আমাদের যে মানসিক অবস্থা, তাতে আমরা ঘড়ির দোলকের

মত একবার সার্বজাতিকতার আদর্শের দিকে ছুটছি, একবার একান্ত স্বাজাতিকতার বিবরের ভিতর ফিরে আসছি; একবার সর্বত্বের লোভ করে নিজত্বকে খোয়াচ্ছি, আবার একান্ত নিজত্বের স্বার্থতুষ্ট সর্বনাশা আকর্ষণে সর্বত্বের সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি; একবার আধুনিক জীবনযাত্রার বিচিত্র চোখ-ধাঁধানো প্রকরণ-পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছি, একবার প্রাচীন জীবনযাত্রার আদিম সারল্যে ফিরে যেতে চাইছি; একবার বর্তমান কালোচিত প্রগতির মনোভাবকে বরণ করছি, একবার অতীতের গহনে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছি; একবার শিল্পসভ্যতার অতিরিক্ত ভক্ত হয়ে উঠছি, একবার কৃষিসভ্যতার উপকরণরিক্ত সরল স্বচ্ছন্দতার আদর্শ আমাদের মন কেড়ে নিচ্ছে; একবার পশ্চিমমুখো হচ্ছি, একবার ঘরমুখো হচ্ছি; একবার বিদ্রোহের মনোভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, একবার সব কিছু নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার হতাশা অদৃষ্টবাদের আবরণে স্বীকার করে নিচ্ছি; একবার ভোগস্পৃহা প্রবল হয়ে উঠছে, একবার অতিরিক্ত বৈরাগ্যের চাপে জীবন বিশুষ্ক হয়ে উঠবার উপক্রম। বর্তমান বিশেষ অবস্থায় নানা কার্যকারণের সমবায়ে আমাদের জীবনে এ-জাতীয় দোটানার আর অন্ত নেই। এই দুই বিপরীত টানের মধ্যে আমরা যখন সমন্বয় ঘটাতে পারব, দেখতে দেখতে আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যপথ অবারিত হয়ে উঠবে। কবি তাঁর ভারত-ইতিহাস-সঙ্গত সমন্বয়ের বাণীর মধ্য দিয়ে এই অভ্রান্ত সত্যপথের নির্দেশই আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

'আধুনিক' বাংলা সাহিত্য

শিরোনামার 'আধুনিক' কথাটিকে একজোড়া ইলেক্ চিহ্ন দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে, পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন। এই বিশেষিতকরণ নিতান্ত অকারণ নয়, বলাই বাহুল্য। সত্যি বলতে, আধুনিক কথাটার কী মানে? যে যুগের যা, সেইটেই তো সে যুগের মানদণ্ডে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত; তবে আবার বিশেষ করে আধুনিক কথাটির ব্যবহার কেন? এটা নিশ্চয় এক ধরনের দ্বিরুক্তি, যার কোন আবশ্যকতা নেই। যা সমসাময়িক তা-ই আধুনিক। সাময়িকতা ছাড়া আধুনিকতার এমন আর কোন সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ লক্ষণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি—যার সাহায্যে বলা যেতে পারে, এইটি আধুনিক, এইটি অনাধুনিক। সাময়িকতা কিংবা সাম্প্রতিকতাই যদি আধুনিকতার একমাত্র বিশিষ্ট চিহ্ন হয়, তা হলে একমাত্র সাময়িকতার আভাস দেওয়া ছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের ভালে আধুনিকতার তিলক পরাবার বিশেষ কোন সার্থকতা থাকতে পারে না।

মনে হয়, যাঁরা 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' কথাটা প্রয়োগ করেন, সাময়িকতা ছাড়াও আর-কিছু তাঁরা বোঝাতে চান। যেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে মাত্র রবীন্দ্রোত্তর যুগে—রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যিকরাই সর্বপ্রথমে প্রগতিশীলতার ধ্বজা উড়িয়েছেন। কিন্তু এই আত্মতুষ্টির মূলে বিশেষ কোন যুক্তি দেখা যায় না। আধুনিকতা—ভিন্নার্থে প্রগতিশীলতা—কি শুধু 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যিকদেরই একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য? নয়, নয়, কদাচ নয়। পক্ষপাতবিরহিত মন নিয়ে যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করি তা হলে দেখব যে, প্রত্যেক যুগের চলিত সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণা, সংস্কারগুলিকে খণ্ডন অথবা অতিক্রম করেই সাময়িকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যে যুগে যে সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছে, সে যুগের

মানদণ্ডে সেই সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল ছিল। সাময়িকতার একটা বিশেষ চিহ্ন এই যে, তা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধ্যায়কে অতিক্রম করে সাহিত্যের নূতন সংস্কার রচনা, নূতন পদ্ধতি-প্রকরণ প্রবর্তন করতে যত্নবান হয়। সাময়িকতা একটা বিশেষ স্থিতিকাল, অথবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বললে, একটা বিশেষ কালের স্থিতি। কিন্তু তার মর্মে চলমানতার বেগ নিহিত, যেহেতু পূর্ববর্তী কালের ধ্যান-ধারণা, আচার-বিশ্বাসকে দু পায়ে মাড়িয়েই তার বর্তমান চলা এবং এই চলাও আবার সম্মুখ পথের টানে ভবিষ্যতে বিসর্পিত।

এ কথার অন্যতর প্রমাণ রবীন্দ্রসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনার কথা বলছি না। তাঁর প্রথম বয়সের রচনাবলী যদি আমরা তদানীন্তন কিংবা তৎপূর্ববর্তী কালের অন্যান্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তা হলে দেখব, তাদের ধরনধারণ একেবারেই আলাদা। ভাবে ভঙ্গীতে ভাষায় আর ভাষারীতিতে তারা সম্পূর্ণ নূতন একটা যুগের দ্যোতক। স্মরণ রাখা দরকার, নতুন সাহিত্যিক ভঙ্গীর প্রবর্তকরূপে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় নি। এই বিরুদ্ধতাই প্রগতিশীলতার সব চাইতে বড় নিশানা। কেন না যে পক্ষ থেকে বিরুদ্ধতা আসে, তারা যুগপ্রভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না বলেই তাদের প্রতিকূলতার আলোকে সমালোচ্য ব্যক্তির প্রগতিশীলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রগতিশীলতা আপেক্ষিক একটা গুণ। সংরক্ষণকামীদের বিরোধিতার ভিত ছাড়া প্রগতিবাদ দাঁড়াতে পারে না।

এই দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, মাইকেল মধুসূদন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি (মাইকেলের ন্যায় বলিষ্ঠ আধুনিক লেখক বাংলা সাহিত্যে আর কে হতে পারলেন ?) ; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক গদ্যলেখক ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালে গদ্যে পদ্যে আধুনিক সাহিত্যিক রুচি ও ভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক।

রবীন্দ্রোত্তর এবং রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ যে কালটাকে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাল বলি, তাতে কতকগুলি নূতন সাহিত্যিক সংস্কার ও রীতি-

পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে, যার জন্য তাকে প্রগতিশীল আখ্যা দিতে বোধ হয় কারুরই আপত্তি হবে না। অবশ্য ব্যাপারটা আরও শোভন হত, যদি এই বিশেষ কালের প্রতিনিধি হিসাবে কোন একজন বিশেষ সাহিত্যিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারতুম এবং একক ভাবে তাঁকে এই সম্মান দিতে পারতুম। কিন্তু সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য যাই হোক, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তেমন কোন অপরিসীম প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নি। কাজেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীলতার খ্যাতি অথবা অখ্যাতিটা আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক সকলের মধ্যে প্রায় সমানভাবে বেঁটে দিতে হয়েছে। এই দিক থেকে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে প্রগতিশীল বলাই যথেষ্ট নয়, তা গণতান্ত্রিকও বটে।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি চোখে পড়ে নি যার দরুন বাংলা সাহিত্যের পূর্ব-পূর্ব যুগগুলির থেকে তাকে একটা স্বতন্ত্র গৌরব দেওয়া যায়। প্রগতিশীলতা যদি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ হয়ে থাকে, সে লক্ষণ পূর্ব-পূর্ব অধ্যায়গুলিতেও বিদ্যমান ছিল। কাজেই একমাত্র সাময়িকতার লক্ষণ ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্য আর কোন্ দিক থেকে বিশেষ অর্থে 'আধুনিক' তা বোঝা কঠিন। 'সাময়িক' কথাটির দ্বারা পূর্ণ ব্যক্ত হয় না এমন কোন অর্থ যদি 'আধুনিক' কথাটির সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা হয়ে থাকে তা হলে বলব, আধুনিক শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়েছে। এই অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা এড়াবার জন্য 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' না বলে বলা উচিত 'এ যুগের সাহিত্য'। তা হলেই বোধ করি সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত যথাযথ হয়।

প্রতিবাদীরা বলবেন, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে এমন একটা অভিনব বলিষ্ঠ ভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন যাকে কোনক্রমেই পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। কল্লোল-গোষ্ঠীর আদর্শগত ধ্যান-ধারণা, রচনাশৈলী, আঙ্গিক সবই এমন বিস্ময়কর ভাবে নূতন যে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের শান্ত স্তব্ধ আবহাওয়াকে সচকিত করে এই

প্রথম ঝড়ের হাওয়া বইল। বাংলা সাহিত্য এতকাল নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত স্থির ছিল; কল্লোল-যুগের লেখকেরা তাতে সচলতার বেগ সৃষ্টি করে তাকে কল্লোলিত করলেন। কল্লোলীয় সাহিত্যের পাঁজরে পাঁজরে যেন বিদ্রোহের অশনিধ্বনি নিহিত।

আপাতবিচারে কথাগুলির বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিক আন্দোলনকে যত বড় বিদ্রোহ বলে প্রচার করা হয় তা কি সত্যিই তা-ই? এই জাতীয় আলোড়ন কি বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে আর ঘটে নি? কল্লোলীয় লেখকদের 'বিদ্রোহ'কে এতটা বিশেষ মর্যাদা দেবার কী হেতু থাকতে পারে? স্পষ্ট, রূঢ়, মন-না-রাখা কথা যদি বলতে হয় তা হলে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, কল্লোলীয় আন্দোলনের মধ্যে বয়সোচিত লঘুতা যে পরিমাণ ছিল বিশ্বাসের জোর সে পরিমাণ ছিল না। তরুণসুলভ প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আর উত্তেজনায় পুরাতনকে ভেঙে একটা নতুন কিছু করার নেশা কল্লোলীয় লেখকদের এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে সেই আচ্ছন্নতাই তাঁদের সমগ্র উদ্যম ও সময়, চিন্তা ও কর্মকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছিল—কোন কিছু ভেবে চিন্তে প্রণালীবদ্ধ ভাবে করবার মত তাঁদের না ছিল ধৈর্য, না ছিল মানসিক প্রস্তুতি। তাঁদের বয়সটাই ছিল এ বিষয়ে সব চাইতে বড় বাধা। যত বড় বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি নিয়েই আন্দোলন আরম্ভ করা যাক না কেন, সেই আন্দোলনের পিছনে যদি প্রবীণ বুদ্ধির স্থৈর্য না থাকে তা হলে এক সময় না এক সময় তা মিইয়ে আসতে বাধ্য। ছন্নছাড়া খ্যাপামি, বাঁধ-ভাঙার অনিয়ন্ত্রিত উল্লাস আবেগজীবনে গ্রাহ্য, কিন্তু বিধিবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অচল। সাহিত্যের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি কোনটাই অপরিকল্পিত, আকস্মিক নয়। অন্ততঃ এ কথা মানতেই হবে, যে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পূর্ব-পরিকল্পনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা ব্যর্থ না হয়ে যায় না।

কল্লোল-যুগের আন্দোলনের প্রতি কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। কল্লোলের লেখকদের তৎপরতার পিছনে যে সু-চিন্তা কিংবা গভীর বিশ্বাসের জোর ছিল না তার একটা প্রমাণ এই যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের অনেকেই

আজ পূর্বপথ পরিহার করে 'ভদ্রলোক' লেখক হবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে নিয়োজিত। সাহিত্যিক তৎপরতার এই যে দুই প্রান্ত—দুটিই সমান অশ্রদ্ধেয়। কল্লোলের বিদ্রোহী ভঙ্গীর পিছনে যদি বিশ্বাসের জোর থাকত তা হলে যাঁরা এই বিদ্রোহের প্রবর্তন করেছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁরা তার পরিধিটাকে আরও অনেক দূর সম্প্রসারিত করতেন। কিন্তু কার্যতঃ আমরা কী দেখতে পেলাম? দেখতে পেলাম যে, কল্লোলের লেখকেরা বয়সের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের 'ভুল বুঝতে' পারলেন এবং 'ভুল বোঝা'র পরিণতি স্বরূপ তাঁদের প্রথম জীবনের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। যে বিদ্রোহের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কল্লোলীয় লেখকেরা বাঁধ-ভাঙার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ভূমিতে আজ আর তাঁরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই—সবাই পূর্বতন ক্ষেত্র থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছেন। এমন কখনও হতে পারত না, কল্লোলীয় বিদ্রোহ নিছক ভঙ্গীমাত্র না হয়ে যদি সত্যিকার বিদ্রোহ হত। বয়ঃ এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসটাকে আরও সজোরে আঁকড়ে ধরতে না পারলুম তা হলে বুঝতে হবে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেই গভীর কোন ত্রুটি আছে। এই ত্রুটিই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কল্লোলীয় লেখকদের পূর্বতন বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা ভাববার আছে। প্রথম বয়সে এক রকম আচরণ করে উত্তর বয়সে ভিন্নতর আচরণ করলে প্রথম বয়সের আচরণ নিয়ে আর গৌরব করা সাজে না। কেন না আচরণ পরিবর্তনে এক ধরনের ব্যর্থতার স্বীকৃতিই প্রকাশ পায়, যদিও এর থেকে এ কথা বলা চলে না যে, শেষোক্ত আচরণ প্রথম আচরণ থেকে অধিক শ্রেয়ঃ কিংবা শ্রদ্ধেয়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে শুধু এই যে, পরিণত জীবনে কল্লোল-যুগের লেখকেরা কেউ যে তাঁদের পূর্বতন ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে অধিষ্ঠিত নেই সেইটেই তাঁদের পূর্বতন ভূমিকার আপেক্ষিক অসারতা প্রতিপাদিত করছে। মাত্র পনেরো-বিশ বছরের ব্যবধানে বিশ্বাসের ক্ষেত্র-পরিবর্তনের এর চাইতে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে চোখে পড়বে না। যে লেখকেরা এককালে ফ্রয়েডীয়

বিজ্ঞানের স্বয়ং-মনোনীত ছাত্ররূপে যৌনানুভূতি ও যৌন-বিকারকে সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্যরূপে পরিগণিত করবার অত্যুগ্র সাধনায় মেতে-ছিলেন তাঁরা আজ সাহিত্যে সুস্থ যৌন-চেতনার অভিব্যক্তিকেও ভয় পান। প্রতিক্রিয়া কত চূড়ান্তরূপে বিপরীতমুখী হতে পারে এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত।

পূর্বেই বলেছি, এই বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর কোনটাই সুস্থ নয়। আত্যন্তিক যৌন-চেতনা যেমন মন্দ, কথাসাহিত্যে যৌন-চেতনার অসাড়তা তেমনি অস্বাভাবিক। এককালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-সাহিত্যে এই অস্বাভাবিকতা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমাদের অদ্যকার দিনের 'ভদ্রলোক' সাহিত্যিকেরা যৌন-জীবনের রূপায়ণে পূর্বতন সাহিত্যের অনিষ্টসম্ভাবনাহীন রক্তশূন্য পাণ্ডুর সংস্কারটাকেই অনুসরণ করে চলেছেন! অবশ্য ব্যতিক্রমও কেউ কেউ আছেন। যৌনানুভূতির চিত্রায়ণে এঁরা আবার কল্লোল-যুগের যৌনমনস্কতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন কল্লোল-যুগের পরে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই কথা-সাহিত্যের মারফৎ অতিমাত্র যৌনবিকৃতি পরিবেশন করে কল্লোলীয় লেখকদের উপর দিয়ে তাঁর বিলম্বিত আবির্ভাবের শোধ তুলেছিলেন!

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা কিছুটা সত্যকার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন বিষয়ের গণতান্ত্রিকীকরণে। এঁরা এঁদের দৃষ্টি ও মনোযোগ সমাজের এমন সব স্তরে প্রসারিত করেছেন যা পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ীভূত ছিল না। নীচু তলার মানুষ, যথা কুলী মজুর ধাঙড় মুচি হাড়ি ডোম এবং সাধারণ ভাবে শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের সুখ-দুঃখকে সাহিত্যের পাতায় রূপায়িত করবার এই-যে চেষ্টা তা সত্যি প্রশংসনীয়। এতে একদিকে যেমন লেখকদের বাস্তববোধ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সূত্রটিকেও অনুসরণ করা হয়েছে। আগেকার বাংলা সাহিত্য অভিজাত, উচ্চমধ্য ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা বড় বেশী আচ্ছন্ন ছিল। লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে পাঠকদের রুচিও সেইভাবে

তৈরী হয়েছিল। পাঠকের দৃষ্টি মধ্যবিত্ত সমাজের তলায় আর নামতে চাইত না। রবীন্দ্রোত্তর লেখকেরা তদানীন্তন লেখক-পাঠকের এই সঙ্কীর্ণ সংস্কারটিকে আঘাত করলেন, বেশ জোরালো ভাবেই আঘাত করলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার প্রগতিশীলতার সংস্কার যদি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে এই ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের অস্ফুট জয়ধ্বনি বাংলা সাহিত্যে সেই আমরা প্রথম শুনলাম। তারপর থেকে এই ধ্বনি ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। তবে লক্ষ্য করবার বিষয়, যাঁদের কণ্ঠে এই ধ্বনি প্রথম উদ্‌গিরিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু' চারজন উদ্‌গাতা আজ অব্যাহতিবাদের বিবরে মুখ লুকিয়েছেন এবং ওই নিরাপদ আশ্রয় থেকে সাহিত্যের গণতান্ত্রিক প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করছেন। গণসংযোগমূলক সাহিত্যকে তাঁদের বড় ভয় এবং সেই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে যাঁরা আজ এগিয়ে চলেছেন তাঁদের সাহিত্যক্ষমতায় অহেতুক সন্দেহ। সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপই হয়ে থাকে। এ এক প্রকার পরিহাস যে, এককালে যাঁরা কোন একটি বিশেষ মতবাদের উদ্‌গাতা বা পরিপোষক থাকেন, পরবর্তী কালে তাঁরাই সেটাকে সব চাইতে বেশী আঘাত করেন। সম্ভবতঃ সাহিত্যিক নিয়তির চাকা এই-ভাবেই সচরাচর ঘোরে।

যে কথা দিয়ে নিবন্ধে আরম্ভ করেছিলাম তাতেই আবার ফিরে আসি। আমাদের অভিমত এই যে, 'আধুনিক' কথাটার উপর অতিমাত্র গুরুত্ব আরোপ করে আমরা নিজেদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছি। লেখক যদি শক্তিশালী হন তা হলে আধুনিকতা তাঁর ভিতর আপনা হতেই আসবে, আধুনিকতাকে ধূপধূনায়িত অর্চনার দ্বারা আবাহন করার সার্থকতা দেখা যায় না। সাময়িকতা বা সাম্প্রতিকতা বা যুগপ্রভাব যাই বলুন, তার মধ্যেই আধুনিকতা নিহিত আছে; রচনাকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত করবার জন্যে আদাজল খেয়ে লাগবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। অন্যান্য দশটা বাতিকের ন্যায় আধুনিকতাও একটা বাতিক। এই বাতিকের মোহ যত কমে ততই মঙ্গল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 'আধুনিক' 'আধুনিক'

বলে যিনি যত বেশী উচ্চরব করেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তত বেশী খণ্ডিত। আধুনিকতার প্রতি অতিরিক্ত মোহ দৃষ্টিভঙ্গীকে এমন ভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়, যা সম্যক্ ও সমদর্শিতার পরিপন্থী। বিকৃত মনোভাব-প্রভাবিত লেখনীমুখে balanced judgment সম্ভব নয়। এ কথা আজ জোর করে বলবার সময় হয়েছে যে, আধুনিকতা অতীতের ধারাবাহিক ঐতিহ্যবর্জিত কোন স্থানকালচ্যুত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নয়। বস্তুতঃ, অতীতের সঙ্গে সংযোগসূত্র রক্ষা করেই তার সম্মুখে দৃষ্টি-প্রক্ষেপণ। আধুনিক লেখক সমসাময়িক জীবনের প্রতি যেমন পিঠ দিয়ে থাকবেন না—জীবনবিমুখতা আত্মখণ্ডনেরই নামান্তর—তেমনি সাময়িক জীবনধারাকে নিয়ে অতিরিক্ত কচলাবেনও না। কেন না সেটাও সংকীর্ণচিত্ততার নামান্তর। সাময়িক, আঞ্চলিক, বাস্তব সমস্যাগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তদ্গত হওয়ার অর্থ সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন মূল্যবোধগুলির প্রতি বহুল পরিমাণে অনবহিত থাকা। কোন যথার্থ শিল্পস্রষ্টাই এই এক-চক্ষু হরিণের পথ বেছে নিতে পারেন না। সাময়িক ও সর্বকালীন, আঞ্চলিক ও বিশ্বকেন্দ্রিক, একব্যক্তিক ও বিশ্বজনীন, বাস্তব ও রোমান্টিক সব কিছুকে ব্যাপ্ত করেই আধুনিকতার বৃত্ত পূর্ণ। আধুনিকতা ধারাবাহিকতার স্রোতে বর্তমানের উৎক্ষিপ্ত বুদ্বুদ মাত্র। তবে গোষ্পদে যেমন ব্রহ্মাণ্ড, তেমনি এই বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু নিহিত। শুধু দেখবার চোখ থাকা চাই।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রবণতা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, ওই গতি ও প্রবণতা সুস্পষ্ট দুটি শাখায় বিভক্ত। কথা এবং কাব্য—সাহিত্যের এই দুই মূল সৃষ্টিধর্মী বিভাগের পক্ষেই মন্তব্যটি সত্য। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র হয়ে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক শাখার বিস্তার; অন্য শাখা বিকশিত হয়ে উঠেছে শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকদের রচনাকে কেন্দ্র করে। অন্যপক্ষে, কাব্যের এক শাখা চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘকালীন বৈষ্ণব কবিতার অধ্যায় পার হয়ে, মঙ্গলকাব্যের যুগ শেষ করে, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, রঙ্গলাল-হেম-নবীন-দেবেনসেন-বিহারীলাল-অক্ষয় বড়াল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর উত্তর-সাধকদের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত; অন্য শাখা নিতান্তই আধুনিক। প্রকৃত প্রস্তাবে, তার পথ-চলা শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে, এখনও বলতে গেলে তার শৈশব অতিক্রান্ত হয় নি। কাব্যের এই নবীন শাখার উদ্গম হয় 'সবুজপত্র' 'কল্লোল' পত্রিকাদ্বয়ের সাহিত্য-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এই ধারার কাব্যের প্রধান প্রবক্তা হলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ কবিগণ। শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

লক্ষণীয় যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম দুই শাখারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ, পঞ্চাশ-পূর্ব রবীন্দ্রনাথ আর পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতায় প্রবল পার্থক্য। প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যানুসারী, সাহিত্যের ধারাবাহিক ক্রমরক্ষাকারী, ভাষারীতি

ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে পুরাতনের সংস্কারক কিন্তু বিপ্লবী নন ; পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্রনাথ ভাব এবং আঙ্গিক উভয়তঃ বন্ধনমুক্তিপ্রয়াসী, গতানুগতিবিমুখ, নিজেই নিজের রীতির উদ্ভাবক, এক কথায় সংস্কারমুক্ত বিপ্লবী শিল্পী। পঞ্চান্নর সমসাময়িক কাল কিংবা কিছু আগে থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই যে মৌলিক ভাবান্তর দেখা গিয়েছিল তার মূলে প্রমথ চৌধুরী এবং 'সবুজ পত্র'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। সবুজ পত্র প্রবর্তিত নূতন ভাষারীতির আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ প্রথম-প্রথম দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু পরে এই আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের তরঙ্গশীর্ষে স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রক্ষেপ করেন। সেই থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে যে গুরুতর রূপান্তর দেখা দিয়েছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

অবশ্য এ কথা মানব, কোন শিল্পী-ব্যক্তিত্বই এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তার বিকাশের প্রক্রিয়ার অন্তরালে কোথাও না কোথাও একটা ধারাবাহিকতার ছন্দ লুক্কায়িত থাকে ; সমস্ত বিবর্তন-পরিবর্তন-রূপান্তর সত্ত্বেও ব্যক্তিসত্তার মূল আদলটির কদাচ বিকার ঘটে, জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত চৈতন্যের অখণ্ডত্বে ব্যক্তিত্বের অখণ্ডত্ব। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবার কারণ ছিল না। তবে কথা হচ্ছে, জীবনাদর্শের তারতম্যে জীবনের ছন্দের বড় কম তারতম্য হয় না। বিশ্বাসের পার্থক্য বহুলাংশে জীবনভঙ্গীরও পার্থক্য। এতে যে গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয়, মানবজীবনের উপর তার প্রভাব সুগভীর। বিশেষ, শিল্পীর বেলায় এ কথা আরও বেশী করে খাটে। প্রথম এবং শেষ বয়সের রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকে এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা তার পার্থক্যের স্বরূপটি বুঝতে পারব। মনে হয় বিশ্বাসের পার্থক্যেই পঞ্চান্ন আর পঞ্চান্নোত্তর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরীতির পার্থক্য সূচিত হয়েছিল।

কাব্যক্ষেত্রে প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ ঐতিহ্যাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধক হলেন এইসব কবিকুল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার,

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। মোহিতলাল আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যদিও সূচনায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাব্যজীবনের সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁরা কবিগুরুর সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। আসলে, তাঁরাও ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি, জাতীয় সংস্কারের ছাপ তাঁদের কাব্যদেহের উপর স্পষ্ট। এমন কি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকেও ব্যাপক আর উদার অর্থে এই ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবির দলেই ফেলা যায়। এ কথা কেন বলছি সে তাৎপর্য বোঝা যাবে যদি এঁদের সকলকেই জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিদের পার্শ্বে রেখে তুলনা করা যায়। ঐতিহ্যের সঙ্গে শেষনামীয় কবিদের যোগসূত্র অতিশয় ক্ষীণ। এঁদের শিক্ষা দীক্ষা মেজাজ এবং মানসিকতা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে এতটা বেশী পাশ্চাত্য-নির্ভর যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক সংস্কার থেকে স্বতঃই এঁরা বহু দূরে সরে আছেন। বাংলা কবিতার সনাতন রীতিনীতিপ্রকরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ত করবার বিশেষ কোন চেষ্টা এঁদের কাব্যজীবনের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের কাব্যপ্রেরণা যেহেতু মূলতঃ পাশ্চাত্যমুখী সেইহেতু এঁরা, অন্ততঃ কাব্যের ক্ষেত্রে, দেশের মাটি ও মানুষ থেকে বহুলাংশে বিযুক্ত। অন্য পক্ষে প্রথমোক্ত কবিদের সম্পর্কে এ জাতীয় অভিযোগ করা চলে না। তাঁদের কাব্যভঙ্গীর মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবিসুলভ আঙ্গিকের খরদীপ্তি না থাকতে পারে, হয়তো বুদ্ধির প্রাখর্যের দিক থেকেও তাঁদের কাব্য তুলনায় কিছু খাটো; তবু এ কথা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরাই বাংলা দেশের জাতীয় কাব্য-ঐতিহ্যের খাঁটী প্রতিনিধি। তাঁরা আর যা-ই করুন, তথাকথিত প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা ও অভিনবত্বের নেশায় জাতীয় সংস্কার থেকে বিচ্যুত হয়ে যান নি। দেশের সাগর-সেঁচা রত্ন হেলায় তুচ্ছ করে কেবলই বিদেশী কাব্যসমুদ্র মন্থন করলে অমৃতের বদলে গরল ওঠবার সম্ভাবনাই অধিক, এ জ্ঞান অন্ততঃ তাঁদের আছে।

এইখানেই প্রশ্ন উঠবে, বাংলার সাহিত্যসেবীদের পক্ষে কোন্‌টি সমধিক

গ্রহণীয় পথ? বর্তমানে বাংলা সাহিত্য যে অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে তাকে একটি সন্ধিক্ষণের অবস্থা বলা যায়। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য দুই বিপরীতগামী পথের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এর একটি ঐতিহ্যের পথ, জাতীয় সংস্কারের পথ; অপরটি বিজাতীয়তার পথ। এই দুই পথের একটিকে বাছাই করে নেবার সময় হয়েছে। এ নির্বাচন যত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় ততই মঙ্গল।

নির্বাচনের প্রশ্নে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, জাতীয় সংস্কারের পথই আমাদের পক্ষে সমধিক বরণীয় পথ। কিন্তু এমনি আমাদের সাহিত্যের হাল যে এই জলজ্যান্ত সত্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ শাসনে দেশ দীর্ঘকাল মোহের ঘোরে আবিষ্ট ছিল বলে আজ দেশের এই অবস্থা। বিজাতীয় প্রভাব রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তো বটেই, সাহিত্যের ভিতরও এমন মর্মান্তিক ভাবে প্রবেশ করেছে যে তার বিষ কাটিয়ে ওঠা বড় সহজ নয়। তবে আশার কথা, দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করার পর থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের অভিমুখে দেশবাসীর চেতনার মোড় ঘুরেছে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনি শিল্প-সাহিত্যেও জাতির পুরাতন সম্পদ রীতিনীতি-প্রকরণাদিকে আবার নতুন করে চিনে নেবার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। বিজাতীয়তার মোহময় প্রভাবের দরুন এতকাল শ্রেয়ঃ জেনেও যে পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল, ছিল সংশয়কণ্টকিত মনের ভীরু সংকোচ, আজ তাকে প্রকাশ্যতঃ আঁকড়ে ধরতে কুণ্ঠার কাতরতা অন্ততঃ দেখা যাচ্ছে না। এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, আমাদের মনের উপর থেকে বিজাতীয়তার নাগপাশ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্যধর্মের আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছি। সাহিত্যের একটি দেশকাল-নিরপেক্ষ সার্বভৌম রূপ আছে সন্দেহ নেই, তবে এ কথাও সমান সত্য যে, প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেরই একটি নিজস্ব ধর্ম আছে। সেই স্বকীয় ধর্মের আশ্রয় থেকে স্খলিত হয়ে পরধর্মের মুখাপেক্ষী হওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে

অতিরিক্ত কাঁধ-ঘেঁষাঘেঁষির দ্বারা এই আত্মহত্যার সাধনা আমরা অনেক কাল করেছি, এবারে নিরস্ত হবার সময় হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে ঠিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়জাত নবতর অভিজ্ঞতাই নাকি তাঁর শিল্পজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপন্যাসের আদর্শ তিনি পূরাপূরি বিলাতী উপন্যাস থেকে গ্রহণ করেছেন। এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। ভাব এবং আঙ্গিক উভয়তঃ তিনি ইংরেজী সাহিত্য থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর চিত্র-চরিত্রগুলি আগাগোড়াই ভারতীয়তার দ্বারা মণ্ডিত। দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে আইভান হো-র বহিরঙ্গগত যত সাদৃশ্যই থাকুক, তিলোত্তমা কিংবা আয়েষাকে আমরা কিছুতেই বিদেশী-কন্যকা রূপে ভাবতে পারি না। তেমনি, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মিরান্দার কিঞ্চিৎ বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও তাদের পরিকল্পনায় পার্থক্য বিস্তর। পরিবেশের ভিন্নতাই এই পার্থক্যের কারণ। কপালকুণ্ডলার আন্তর জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশের প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত; মিরান্দার ধাতুগত প্রকৃতি নির্মিত হয়েছে ভিন্নতর উপাদানের দ্বারা। অনুরূপভাবে, দেবী চৌধুরাণীকে কোন-ক্রমেই আমরা, কল্পনাকে অসম্ভবের সীমায় টেনে নিয়ে গিয়েও—ইউরোপীয় পরিবেশের ভিতর স্থাপন করতে পারি না। প্রফুল্ল দৃশ্যতঃ কঠিনপ্রাণ দুঃসাহসিকা, অন্তরে স্নেহস্নিগ্ধা কোমল-হৃদয়া নারী। স্বামী-রূপ আইডিয়ার প্রতি অপরিসীম ভক্তি তাঁকে বিনিঃশেষে ভারতীয় নারী করে তুলেছে।

এ সব কথা বলার অর্থ, ভাব এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তো বটেই শিল্প-সংস্কারের বেলায়ও বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর অপরিসীম সাফল্যের মূলও এইখানেই। হতে পারে তাঁর কোন কোন মতবাদ আজকের ভাবাদর্শের মানদণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল নয়, এমন কি তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত এখনকার বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল

প্রতিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়, কিন্তু এ সব তাঁর শিল্পনৈপুণ্যকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারে নি। ভারতীয় আদর্শের প্রতি চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারক রূপে যে গভীর নিষ্ঠা তাঁর ছিল, সেই নিষ্ঠা তিনি শিল্পরূপায়ণেও সমান প্রয়োগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পরিবেশ, ঘটনা, চরিত্র-পরিকল্পনাদি একান্তভাবেই ভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা ভাল করেই জানতেন যে, বিজাতীয় ভাব পরিবেশন করে বাঙালী পাঠকচিত্তকে কোন সময়েই আপনার করে নেওয়া সম্ভব হবে না। কর্মজীবনে যিনি যত বড় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিই হোন না কেন, ভাবজীবনে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব খাটাতে যাওয়ার বিপদ অনেক। স্বাজাতিকতার আদর্শের বিরোধী বলেই এঁ জিনিস অশ্রদ্ধেয় তাই নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও তার অনুপযোগিতা স্পষ্ট। কেন না এদেশীয় জনমনের দ্বারা সে জিনিস গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু আদর্শবাদী ছিলেন না, বিচক্ষণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্নও ছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই দ্বিবিধ বৃত্তির সুষ্ঠু সমন্বয় দেখতে পাই। ইউরোপীয় সাহিত্য তিনি অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু ছোটগল্প আর উপন্যাসের ভিতর তিনি বাংলা দেশের একান্ত নিজস্ব পরিবেশকেই প্রাধান্য দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে এতটুকু বিজাতীয় গন্ধ কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না। হয়তো আঙ্গিকের পরিকল্পনায় ইউরোপীয় ছোটগল্পের সূক্ষ্ম প্রভাব আছে, কিন্তু রবীন্দ্ররচিত ছোটগল্প ও উপন্যাসের ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রকল্পনায় বিজাতীয়তার নামগন্ধও নেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এ কথা আমরা প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলছি, দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ পঞ্চাশোত্তর বয়সের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রযোজ্য।

প্রথম পর্বের উপন্যাস, যথা 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' প্রভৃতির মধ্যে এবং গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ জাতীয় সংস্কারকেই অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের যে ধারার প্রবর্তন করে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সৃষ্টিকর্মের ভিতর তাকেই

কমবেশী অনুসরণ করেছেন। প্রতিভার ধর্ম অনুযায়ী তিনি সেই ধারার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে এ কথা মানতেই হবে যে, তাঁর কাল্পনিকতা ও মানসিকতার শিকড় সম্পূর্ণই ভারতীয় মনের মাটিতে নিহিত ছিল। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সঙ্গে শেষ বয়সের রচিত 'তিন সঙ্গী'র গল্পত্রয়ের কিংবা 'গোরা'র সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র তুলনামূলক আলোচনা করলেই এ কথা বোঝা যাবে। গল্পগুচ্ছ এবং গোরা পূরাপূরি স্বদেশীয় আবহাওয়ার দ্বারা মণ্ডিত; পক্ষান্তরে "ল্যাবরেটরী", "রবিবার" প্রভৃতি গল্প এবং 'শেষের কবিতা' উপন্যাস বিজাতীয় ভাবসম্পৃক্ত তথাকথিত আধুনিক রচনাসুলভ হাল্কা চটুলতার দ্বারা আবিষ্ট। 'চতুরঙ্গ' আর 'ঘরে-বাইরে' থেকে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর এই পরিবর্তনের শুরু। পরে ধীরে ধীরে তা কাব্যকলায়ও প্রসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রচিত্রকলার মধ্যেও একই পরিবর্তিত প্রক্রিয়ার পরিচয় পাই। 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল' প্রভৃতি আধুনিক পত্র-পত্রিকার সাহিত্য-আন্দোলনের ফলেই যে উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর ঘটেছিল তা অনুমান করা চলে।

শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। তিনিও উপন্যাসশিল্পে মুখ্যতঃ জাতীয় ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের পরে একই ধারার সশ্রদ্ধ অনুসরণ করেছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ। উল্লিখিত নামপঞ্জীর ভিতর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভুক্তিকরণ সর্তাধীন, কেন না প্রেমেন্দ্র মিত্র কতকাংশে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, কতকাংশে বিদেশী রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পীজীবনের যে অংশ ঐতিহ্যাশ্রয়ী সে অংশ সার্থক, যে অংশ পাশ্চাত্ত্য-নির্ভর সে অংশ খণ্ডিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবজীবনে বিপ্লবী মনোবৃত্তির বাহক হলেও দেশীয় জলহাওয়ামাটির সঙ্গে তাঁর রচনার নিবিড় যোগ; তিনি খাঁটী বাঙালী লেখক।

নিবন্ধের গোড়াতেই বলে নেওয়া হয়েছে, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ স্বতন্ত্র ধারার লেখক। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী

স্পষ্টতঃই পাশ্চাত্যভাবের দ্বারা অভিভূত। অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুইজন সুপরিচিত প্রবীণ লেখক। তাঁদের শক্তিমত্তা অনস্বীকার্য, তবে তাঁরা যে পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছেন সে পথে পরিপূর্ণ সিদ্ধি বোধ হয় করায়ত্ত হবার নয়। তাঁদের রচনার প্রকাশরীতি, ভাষাভঙ্গী একান্তরূপেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের রীতিনীতির স্মারক।

কথা-সাহিত্যের সম্পর্কে যে কথা বলা হল বাংলা কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। জাতীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সংস্কার অবলম্বন করে কাব্যদেহ গড়ে না উঠলে সে কাব্য কদাচ জনমনের গ্রাহ্য হয় না। যদি কেউ বলেন জনমনের জন্য কাব্য নয়, পরন্তু রসিক সুজনের উপভোগের জন্যই কাব্য, তার উত্তর এই যে, ছোট মাপের কবিতা অর্থাৎ খণ্ড বা গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও হতে পারে, তবে বড় মাপের কবিতার বেলায় নয়। মহাকাব্য বা বৃহদায়তন নাট্যকাব্য-জাতীয় সার্থক কাব্যসৃষ্টির ভোক্তা রসিক-অরসিক দুইই। বড় বড় কাব্যসৃষ্টি ব্যাপক প্রচার ও পঠন-পাঠনের দরুন দেশের ভিতর যে ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তা পরোক্ষে সাধারণ মানুষের মনকেও প্রভাবিত করে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সার্থক কাব্য-সৃষ্টিমাত্রই জাতীয় সম্পত্তি। এ কথার প্রমাণ উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও কাব্য-সাহিত্য; এ কালীন সাহিত্যের পরিসরের ভিতর মর্যাদায় ও গুণে এগুলির সহিত তুলনীয় কিছু না পাওয়া গেলেও নিকটতর উদাহরণ হিসাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ছোটখাটো উদাহরণ হিসাবে 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'পলাশীর যুদ্ধ,' 'বৃত্র-সংহার' 'কথা ও কাহিনী' প্রভৃতির নাম করতে পারি। শেষোক্ত কবিতার বইটির প্রভাব শুধু বিদগ্ধ নাগরিক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের স্বল্পশিক্ষিত বা একেবারে অনক্ষর সাধারণ মানুষও কোন না কোন ভাবে এই বইয়ের রচনাগুলির রসাস্বাদনের অধিকার লাভে সমর্থ হয়েছে। 'কোন না কোন ভাবে' অর্থাৎ পরোক্ষ ভাবে, সাক্ষাৎ পঠন-পাঠনের দ্বারা নয়। এ সকল কাব্যসৃষ্টির প্রভাব বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়ানো আর তাই এ গুলি

সর্বব্যাপী শ্রুতির আকারে সাধারণ মানুষের মনোজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

এত কথা বলা শুধু জাতীয় ঐতিহ্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে সকল কবি এই সনাতন ধারার অনুসরণ আর যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তার সম্প্রসারণ-চেষ্টায় ব্রতী আছেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত জনমনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির দ্বারা ধন্য হবেন, ভিন্নধর্মীদের কাব্যপ্রয়াস আংশিক খণ্ডিত আর ব্যর্থ হওয়াটাই বিধিলিপি। জীবনানন্দ অমিয় চক্রবর্তী সুধীন্দ্র দত্ত বিষ্ণু দে-রা যে রীতির অনুসরণে কাব্যচর্চা করেছেন বা করছেন তা আমাদের স্বদেশীয় কাব্যরীতির বিরোধী। এমন যদি বোঝা যেত যে, তাঁরা স্বদেশীয় কাব্যসংস্কার আত্মস্থ করে তার পর বিদেশী কাব্যকলার অনুসরণে হাত দিয়েছেন এবং স্বদেশী ভাবমূর্তির উপর বিদেশী রঙ চড়িয়ে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টায় আছেন তা হলে বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু এ তো তা নয়। এ যে আগাগোড়াই বিজাতীয়। জাতীয় ঐতিহ্ আর জাতীয় কাব্য-সংস্কারের সঙ্গে এঁদের মানসিক যোগ নিতান্ত ক্ষীণসূত্রে লম্বমান বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশীয় জীবনধারার সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্থাপনের চেষ্টা নেই আগ্রহ নেই; সব একেবারে কাব্যসাহিত্যে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাব আর আঙ্গিক জীর্ণ করবার সাধনায় লেগে গেছেন। এ যে কত বড় আত্মবঞ্চনা, তা বলে বোঝানো যায় না। কী সুদুঃসহ ফাঁকী এঁদের এই পরানুকরণ-প্রয়াসের অন্তরালে গুপ্ত আছে তা যদি এঁরা জানতেন তা হলে অন্ততঃ আত্মরক্ষার তাগিদেই এঁরা এঁদের অনুসৃত পন্থা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

জানি, তরুণ মহলে এঁদের কবিতার কিছু-কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। কিন্তু তারুণ্যের স্বীকৃতির দ্বারা কোথায় কবে শিল্পের গুণাগুণ নির্ণীত হয়েছে? কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করতে হলে যে বিচারবুদ্ধি ও স্থৈর্যের প্রয়োজন, তা দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। এমন কি সহজাত যে হৃদয়-সংবেদন ক্ষমতা, চিন্তন-মননের দ্বারা তাও পরিপক্ক হওয়ার অবকাশ আছে।

হৃদয়াবেগ আর অনুভূতির সম্পদ যতই থাকুক, অনুশীলনের দ্বারা জীবনে এই বৃত্তিগুলির যথেষ্ট পরিমাণে পরিমার্জনা না ঘটলে তা থেকে তেমন সুফল বর্তায় না। কাজেই চাই বিচারবুদ্ধির স্থৈর্য আর অনুভূতির সম্যক্ পরিশীলন। বলা বাহুল্য, এ দুয়েরই জন্য প্রয়োজন কিঞ্চিৎ বয়সের ভারের। সাধনা ব্যতিরেকে যেমন কাব্যস্রষ্টা হওয়া যায় না, তেমনি অনুশীলন ব্যতিরেকেও কাব্যবোদ্ধা হওয়া যায় না। অতএব তরুণ মনের কাব্যরসগ্রহণক্ষমতাকে সর্বদাই কিঞ্চিৎ সর্তাধীনে স্বীকার করা ভাল। তরুণ সম্প্রদায়ের উপর জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির ঠিক ততখানিই প্রভাব যতটা পরিমাণে তাঁরা স্বীয় দেশের কাব্যসংস্কার সম্পর্কে অচেতন। আধুনিক বিদেশী কাব্যকলার সম্পর্কে একপ্রকার ভাবালু মোহই এঁদের অনুচিত ক্ষেত্রে কাব্যোৎসাহী করে তুলেছে।

বিদেশী শিল্পসংস্কার অনুসরণপ্রয়াসমাত্রই অশ্রদ্ধেয় তা বলি না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন স্বীকার্য। তবে যে কোন বিদেশী ভাবই হোক, তাকে জীর্ণ ও আত্মীকৃত করা চাই। এখানেই ঘটে যত বিপত্তি। জীর্ণকরণের ক্ষমতা সকলের থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা সম্পর্কে যাঁরা বিদেশী প্রভাবের যুক্তি উত্থাপন করেন তাঁরা ভুলে যান যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিঙ্‌ প্রমুখ ইংরেজ কবিদের কাছ থেকে যতটুকু তিনি নিয়েছেন তাকে আত্মীকৃত করেই নিয়েছেন, সে প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের মজ্জার মধ্যে মিশে গিয়েছে, সে শুধু কাব্যের দেহাবরণ হয়ে থাকে নি। আর খতিয়ে দেখলে, রবীন্দ্রকাব্যের উপর স্বদেশীয় সংস্কারের প্রভাব যত প্রবল, বিদেশী কাব্যকলার প্রভাব তার সিকির সিকিও নয়। বিদেশী আঙ্গিকের ধরাছোঁয়া প্রভাব তাঁর কবিতায় এসেছে শেষের দিকে। 'পুনশ্চ'-এর কবি রবীন্দ্রনাথ আর 'মানসী' কিংবা 'সোনার তরী'র কবি রবীন্দ্রনাথ এক নন। প্রথম পর্বের কবি রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের ভিতর ভারতীয়তার আধিপত্য সুপ্রকট। উপনিষদ্, বৌদ্ধযুগীয় ভারতবর্ষের শুচি-সুন্দর আবহাওয়া, গুপ্তযুগের কবি কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত কবি, মধ্যযুগীয় কবিসাধকদের দোঁহা ও ভজন,

বৈষ্ণব পদাবলী, বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো লোকগাথা আর আউল-বাউল প্রভৃতি সহজিয়াপন্থীদের অনাড়ম্বর জীবনচর্যা ও বিশ্বাস—এ সব বিচিত্র প্রভাবের সমবায় ছাড়া রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে আমরা কল্পনা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ যদিও উত্তর-জীবনে আন্তর্জাতিক আদর্শের পোষকতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব পাঁচ হাজার বৎসরের ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিতর যা কিছু মহান, সুন্দর ও বরণীয় তারই শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ফল মাত্র। খাঁটি জাতীয়তাকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলেছেন এবং শেষ অবধি আন্তর্জাতিকতায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সমাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণ চরিতার্থতা ঘটেছে। বলাই বাহুল্য যে, যথার্থ স্বাজাতিকতার সঙ্গে যথার্থ আন্তর্জাতিকতার আদর্শের বিরোধ নেই। মেকী আন্তর্জাতিকতায় দেশ ভরে গেছে, তারই জন্যে সাহিত্যেও ফাঁকি ও মেকীর কদরের অভাব নেই।

পরিশেষে বক্তব্য, বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের আজ আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা দ্বিধাহীন ভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে—আধুনিক বাঙালী শিল্পী সাহিত্যিক কবি শিল্পপ্রেরণার উৎস কোথায় খুঁজবেন? জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে, না, বিজাতীয় ভাবধারার মধ্যে? যদি উত্তর প্রথম বিকল্পের অনুকূল হয়, তা হলে এখন থেকেই আমাদের সেই পথের সাধনা করতে হবে। বিজাতীয় প্রভাবের আত্ম-অবমাননাকর গ্লানি থেকে যে পরিমাণে আমরা আমাদের সাহিত্যকে মুক্ত করতে পারব সেই পরিমাণে আমাদের সাহিত্যের আবহাওয়া শোধিত হয়ে উঠবে। এবং তদনুপাতে আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দও স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর যদি ভ্রান্তবুদ্ধির বশে শেষোক্ত বিকল্পটিকেই আমরা অবলম্বন করি—যেমন 'কল্লোল'-আশ্রয়ী লেখকগোষ্ঠী করেছিলেন—তা হলে তার পরিণাম বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই সে পথে অগ্রসর হতে হবে। পরিণামটি যে আত্ম-অবলুপ্তি ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা বিশদ বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

বাংলা সাহিত্যের সমস্যা

সাহিত্যের সমস্যা নানা রকম। কখনও বস্তু ও রূপের আপেক্ষিক গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্নে এই সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিতে পারে, কখনও সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্যে চিরন্তন মূল্যমান বলে কিছু আছে কি না এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে; কখনও সমস্যার উদ্ভব হয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের তুলনামূলক বিচার অবলম্বন করে; আবার কখনও নিছক সমসাময়িক কালের সাহিত্যের স্বকীয় বিশেষ ভাবনাচিন্তাগুলিও সমস্যার বিষয়ীভূত হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে অন্য সব বিচার বাদ দিয়ে শুদ্ধমাত্র শেষোক্ত মানদণ্ডে সাহিত্যের সমস্যা বিচারের চেষ্টা করা হবে। তা-ও সাধারণভাবে সমসাময়িক সাহিত্য নয়, সমকালীন বাংলা সাহিত্যই এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বলতে গত ত্রিশ বছরের বাংলা সাহিত্যকে বোঝালে পর্ববিভাগ মোটামুটি ঠিক হয়। সমালোচকের প্রবণতা অনুযায়ী এর আগে কিংবা পরে থেকেও সমসাময়িকতার নির্দেশ করা যায়; তবে আমরা আমাদের সুবিধার খাতিরে ওই ত্রিশ বছরের সীমা থেকেই আলোচনার সূচনা করতে চাই। অর্থাৎ চিহ্নিত যুগটি বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে 'কল্লোলোত্তর যুগ' নামে পরিচিত। কল্লোল সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করে এখন থেকে তিরিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের পূর্ব-পূর্ব আন্দোলন থেকে এই আন্দোলনের চেহারা আর মেজাজ ছিল কিছু আলাদা। সেই কারণে কল্লোলের অভ্যুদয়ের সময়কে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের প্রারম্ভিক কাল ধরে নিলে সমসাময়িকতার বিচারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা যেমন কম থাকে, তেমনি সাহিত্যের একালীন বিশেষ ধারা-ধরন আর সমস্যাকেও বোঝার সুবিধা হয়।

কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের স্বাদ-গন্ধ কিঞ্চিৎ আলাদা, এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আলাদা মানেই উৎকৃষ্ট পর্যায়ের বস্তু নয়। কল্লোল আর কল্লোলপরবর্তী বাংলা সাহিত্যের স্বাদ-গন্ধের ভিন্নতার মধ্যে যেমন কতক গুলি ভাল উপাদান আছে, তেমনি তাতে বিসদৃশ উপাদানেরও অসদ্ভাব নেই। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে যে জিনিসটি সব চাইতে লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা হচ্ছে, এঁরাই প্রথম সচেতন ভাবে বাংলা সাহিত্যে নির্যাতিত, শোষিত শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যোচিত বিষয়ের মর্যাদা দান করেন। যারা এতকাল দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল, সেই সব অবজ্ঞাত অনাদৃত মানুষের দল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দরবারে ভিড় করে এসে জায়গা জুড়ে বসল। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মুখ্যতঃ অভিজাত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল; শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের স্তরে তাঁর কল্পনাকে সম্প্রসারিত করলেও তার বেশী আর অগ্রসর হন নি; কিন্তু শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখায় সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্যজনেরা আর অকুলীন রইল না। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে গণতান্ত্রিকতার বাধাবন্ধহীন অভিযান শুরু হয়েছে। কল্লোলের লেখকগণ সেই যে গণমানসের বেদনা ও আশাকে ভাষায় রূপদানের সূত্রপাত করলেন, সেই ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট রেখাচিহ্ন অনুসরণ করেই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের পথ-পরিক্রমা ও অগ্রগতি ঘটেছে।

কিন্তু এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে ওই আন্দোলনের মধ্যে কতিপয় বড় রকমের বিচ্যুতিও ছিল। যেমন, চিত্তের মুক্তির নামে নরনারীর জৈব মিলনের সংস্কারকে কল্লোলীয় লেখকদের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দান। ইউরোপীয় দার্শনিকশ্রেণীর একাংশের প্রচারিত ভোগবাদের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর কল্লোলীয় লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা, এবং স্বভাবতঃই এই মতবাদে প্রবৃত্তির উদ্দামতা অনুচিতভাবে প্রশ্রয় পেয়েছিল। কল্লোলীয় লেখকগণ শুধু দেহবাদী ছিলেন না, দেহবিলাসীও ছিলেন। যুদ্ধোত্তর কালের অস্থিরতা আর অনৈশ্চিত্য এই অসুস্থ মনোভাবের মূলে অনেকখানি পরিমাণে সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। আজ পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব,

কল্লোলীয় লেখকদের এই ভ্রান্ত পথগামিতার ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সমাজজীবনে, বিশেষ, সমাজের নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর যে সকল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নজীর দেখতে পাওয়া যায় তার একাংশের প্রেরণা সমসাময়িক সাহিত্য থেকে আসে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য সিনেমার মতই এ ক্ষেত্রে তরুণ মনের উপর অনুচিত প্রভাব বিস্তার করে। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সৌষ্ঠব বিধানে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল প্রভৃতির দান অনস্বীকার্য, তবে তাঁদের রচনার প্রভাবে তদানীন্তন নবীন সম্প্রদায়ের মনোজীবনের ক্ষতিও বড় কম হয় নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হওয়া সত্ত্বে এঁর রচনায় তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মত যৌনমনস্কতার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। কি ভাষায়, কি কলাকারুর ক্ষেত্রে, কি চিন্তায় প্রেমেন্দ্র-সাহিত্য সুদৃঢ় সংযমের শাসনে শাসিত। এই আত্ম-আরোপিত সংযমের সংস্কার স্বতঃই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তৎকালীন অন্য সকল অগ্রসরধর্মী লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। তবে বিজাতীয় প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত নন, এ কথা বলতেই হবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পরবর্তী আর এক ধাপে শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় দেহবাদের সংস্কার পুনরায় কিঞ্চিৎ অত্যুগ্র রকমে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এ পথে তাঁর বিশেষ কোন সহসঙ্গী না থাকায় ওই পর্যায়ে দেহবাদী সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব খুব বেশী দূর বিস্তৃত হতে পারে নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের আত্মকেন্দ্রিক মালিন্যের পাশেই ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের সদ্দৃষ্টান্ত। ওই দৃষ্টান্তপ্রভাবে বাংলা সাহিত্য অনেকখানি পরিমাণে আত্মস্থ হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কল্লোল-সাহিত্যের শৈল্পিক মনোভঙ্গীর পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার ভিতর আবেগের প্রভাব যেরূপ প্রবল, বুদ্ধির প্রাখর্য তেমন নয়। কল্লোলীয় লেখকদের বলবার কথা ছিল অনেক, কিন্তু

সে বক্তব্যের প্রাচুর্য মূলতঃ আবেগপ্রসূত, মননশীলতার কঠোর যুক্তি-শৃঙ্খলার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। অর্থাৎ এ সাহিত্যের মেজাজ আগাগোড়াই ছিল রোমান্টিক ; ক্লাসিকাল সাহিত্যের সচেতন ফর্মনিষ্ঠা ও চিন্তার দৃঢ়সংবদ্ধতা এ সাহিত্যে অনুপস্থিত ছিল। চিন্তার দিক দিয়ে কল্লোলীয় লেখকদের পুঁজি ছিল যৎসামান্য। যেটুকু চিন্তা তাঁদের উপজীব্য ছিল তা-ও তাঁরা আহরণ করেছিলেন ইউরোপের চোরাবাজার থেকে। এ দেশের চিন্তার ধারা বা আদর্শবাদী জাতীয় চেতনার সঙ্গে নূতন আমলের লেখকদের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের দ্বারা তাঁদের চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট ছিল। দেশজ ধ্যান-ধারণাগুলির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাকে জাতীয় প্রতিভা বা জাতীয় আত্মা বলে তার সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। সুতরাং তাঁদের মানসিক গঠনে একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য আবেগ, কিন্তু তা যদি সচেতন বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে নিছক আবেগের প্রাবল্য আমাদের খুব বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না। চাই অনুভূতি ও জ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়। তবেই সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে। এর একটির অসদ্ভাবে এবং অন্যটির মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্যে শিল্পকর্মের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছিল অত্যধিক আবেগনির্ভরতার ফলে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের বেলায় ; যেমন হয়েছিল বুদ্ধিবাদ বা মননশীলতার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক আরোপিত হওয়ায় পরবর্তী কালীন 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর লেখকদের বেলায়। আমাদের সাহিত্যে অনুভূতি ও মননশীলতার সার্থকতম ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। তারপরেই বঙ্কিমচন্দ্র। এর পরে আর যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গীতে অল্পবিস্তর একদেশদর্শিতার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। রুচি ও প্রবণতা ভেদে কারও রচনা মানসিক তৌলদণ্ডের এপাশে ঝুঁকেছে নয় তো ওপাশে ঝুঁকেছে। যথা, শরৎ-সাহিত্যের আত্যন্তিক ভাবালুতার সংস্কার ; বিপরীতে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের প্রখর বুদ্ধিবাদ। এই দুই

চূড়ান্ত প্রান্তীয় অভ্যাসেরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কল্লোল-সাহিত্য আর পরিচয়-সাহিত্যে। কল্লোলীয় লেখকদের অনুশীলনের ধারা শরৎ-সাহিত্যের খাতে চালিত হয়েছিল ; পক্ষান্তরে পরিচয়-কেন্দ্রিক লেখকগণ প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত পুরঃসর করে প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিবাদী সাহিত্যের আদর্শটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এই একচক্ষু সংকীর্ণতার অভ্যাস বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভফলদায়ক হয় নি, তা বোধ হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পর্যবেক্ষক মাত্রই স্বীকার করবেন।

কিন্তু কল্লোলীয় লেখকদের মানসিক গঠনের সব চেয়ে বড় অপূর্ণতা আদর্শবাদের অভাব। তাঁদের রচনার পশ্চাতে কোনরূপ সুগভীর প্রত্যয় ছিল বলে মনে হয় না। তা যদি থাকত তাঁদের সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকে মোটামুটি রকমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম হতে পারত। তা হয় নি। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এসেছে রাজনীতির সূত্রে, সাহিত্যের সূত্রে নয়। সত্য বটে তিরিশের বৎসরগুলিতে যে সকল লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেই নির্যাতিত, শোষিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ বেদনা আন্তরিক হলেও গভীর প্রত্যয়জাত কি না সন্দেহ। কতকটা প্রবহমাণ ভাবাদর্শের প্রভাবে, কতকটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দুর্দশার দৃষ্টান্তে ব্যথিত হয়ে তাঁরা তাঁদের কল্পনাকে গণ-জীবনের স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন, তাঁদের অনুকূলে এই মাত্র বলা যায়। অথবা এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বৈচিত্রের খাতিরে নতুন দিকে বিষয়বস্তুর মোড় ফেরানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল বলেই হয়তো তাঁরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক গণ-জীবনের পরিধির ভিতর তাঁদের দৃষ্টি সঞ্চালিত করেছিলেন। মোটের উপর, এই দৃষ্টিভঙ্গিমার পিছনে বিশ্বাসের জোর যত না ছিল তার চাইতে বেশী ছিল অভিনবত্বের মোহ।

অন্য একটি সূত্র থেকেও এ কথা প্রমাণ করা যায়। ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পাশে পাশেই আমাদের আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছে দেখতে পাই। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, জাতীয়তাবাদী

মুক্তি-সংগ্রামের অন্তর্নিহিত আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণের আদর্শ তৎকালীন আধুনিক লেখকদের মনোজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নি। ১৯৩০-৩১ সনের আইন-অমান্য আন্দোলন গণ-চিত্তে যে ভাবের আলোড়ন এনেছিল, তা বাংলা দেশের তৎকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের চিত্তে তেমন কোন ভাবের স্থষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ নেই। পরিতাপের হলেও এ কথা সত্য যে, জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সা কল্লোলীয় লেখকদের চিত্ত তেমনভাবে স্পর্শ করে নি। তাঁরা ইউরোপীয় ভাবের খাতে আগত ব্যক্তিমুক্তির আদর্শটাকেই তাঁদের লেখায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভাষান্তরে, তাঁদের চিত্তের মুক্তির আন্দোলন জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সমান্তরালবর্তী হয়ে চলেছে, এক স্রোতে লীন হয়ে যেতে পারে নি। এর কারণ, এ সত্য কল্লোলীয় লেখকদের অজ্ঞাত ছিল যে, জাতীয় মুক্তির আদর্শ আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একই বৃহত্তর আদর্শের এপিঠ আর ওপিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির পূর্ণতা ঘটতে পারে না। জাতীয় মুক্তি বৃহত্তর মুক্তির উপলব্ধির পথে অপরিহার্য একটি ধাপ। স্থতরাং প্রবল অনুভূতিপরায়ণ যে মানুষ—শিল্পী-সাহিত্যিক—তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে অনবহিত থাকা ঘোরতর বিচ্যুতি।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে এই বিচ্যুতি দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই প্রকট। তাঁদের প্রচারিত গণমুক্তির আদর্শ বাস্তব জীবনে সক্রিয় কর্মাদর্শের ভিতর রূপান্তরিত হতে পারে নি। এ কথার যাথার্থ্য আমরা তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব যখন সমসাময়িক লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মনোভঙ্গীর সঙ্গে কল্লোলের লেখকদের মনোভঙ্গীর তুলনায় প্রবৃত্ত হব। 'থার্ডক্লাশ', 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নির্যাতিতের প্রকৃত স্থহৃদ্ ছিলেন। তাঁর এই সৌহার্দ কল্লোলীয় লেখকদের মত শুধু সাহিত্যের পাতাতেই আবদ্ধ ছিল না, তাকে তিনি হাতে-কলমেও রূপদান করে গেছেন। শুদ্ধির আদর্শ প্রচারের জন্য কোল ভীল মুণ্ডা হো আর ওঁরাওদের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ সেবার কাজ স্থবিদিত। অর্থাৎ নিছক ভাবালুতার মধ্যেই রবীন্দ্র

মৈত্রের মানবপ্রীতি ও পরোপচিকীর্ষা ক্ষয়িত হয় নি, তাকে তিনি নিঃস্বার্থ সেবা আর আত্মত্যাগের আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করেছিলেন। এ রকম সক্রিয় জনসেবার দৃষ্টান্ত আমরা কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি ধূপছায়া-পরিচয় প্রভৃতি তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্য-পত্রিকার আশ্রয়ী পাশ্চাত্তামুখী লেখক-সাহিত্যিকদের বেলায় কল্পনাও করতে পারি না। তাঁরা অশ্লীলতার দায়ে বরং জেলে যেতে প্রস্তুত, তবু সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার মত মনোবল সংগ্রহে নারাজ। সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধরনের মূলহীন, ফাঁপা রোমান্টিক মনোভঙ্গী থেকে এই জাতীয় একপেশো আচরণের উদ্ভব। এই মনোভঙ্গীর যাঁরা পরিপোষক, তাঁদের দৃষ্টিতে তথাকথিত যৌন অবদমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটা মস্ত বড় বিষয়; কিন্তু এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে, নরনারীর দেহগত সংস্কারটাই জীবনের একমাত্র সংস্কার নয়। এ ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক সাহিত্যিকের মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। এঁরা চিত্তের মুক্তির কথা বলেন, কিন্তু সমাজে যেখানে অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক স্তরে সর্বব্যাপী পরবশতার আবহাওয়া বিদ্যমান. সে স্থলে যে-কোন সুযোগে-হাতের-মুঠো-গলে-বেরিয়ে-যাওয়া চিত্তের মুক্তি কী করে সম্ভব ভাল বোঝা যায় না। দেশের বাস্তব অবস্থা জানবার চেষ্টা করব না অথচ এদিকে ইউরোপের আনকোরা চিন্তার আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকব—এ রকম স্বতোবিরোধ, জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবাস্তব লেখনীকারদের পক্ষেই শুধু সম্ভব।

কল্লোলের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে আর একটি বিষের সংক্রমণ হয়—দলীয়তা। দলীয়তার বিষবাষ্পে বাংলা সাহিত্যের আজকের দিনের আবহাওয়া সমাচ্ছন্ন। অদ্যকার দিনের প্রায় প্রতিটি লেখক কোন-না-কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। এই দল কখনও পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গঠিত, কখনও তা রাজনীতিকেন্দ্রিক, কখনও ব্যক্তিগত পরিচয়, বন্ধুত্ব, ব্যবসায়িক স্বার্থ, একই অঞ্চলে বাস প্রভৃতি বিচিত্র কারণের ফলে সম্ভূত। রচনার নিজস্ব গুণগত উৎকর্ষ আজ আর লেখকের বড় জোর নয়, দলের জোরটাই জোর। সঙ্ঘবদ্ধতা ভাল জিনিস, কিন্তু যেহেতু সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সুকুমার কলা নিভৃত-সঞ্চারী কল্পনা আর

একক চেষ্টার ফল, সেইহেতু শিল্প-সাহিত্যের বেলায় সঙ্ঘবদ্ধতা সব সময় শুভংকর না-ও হতে পারে। দলীয় সংহতি যেখানে ঐক্য-চেতনা আনে সেখানে তা ভাল, কিন্তু যেখানে তা মতের বা চিন্তার uniformity-র উপর জোর দেয় সেখানে তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী ; অতএব অশ্রদ্ধেয়।

দলীয় উগ্রতার অভ্যাস কল্লোল-এর আমল থেকেই বিশেষভাবে শুরু হয়, এ কথা বললে আশা করি অতি-ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে না। অবশ্য দল বাংলা সাহিত্যে আগেও ছিল—ভারতী, সবুজ পত্র প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকাগুলির শক্তিশালী নিজস্ব লেখক-গোষ্ঠী ছিল—কিন্তু রাজনৈতিক গোষ্ঠীসুলভ দৃঢ়-সংবদ্ধ দলীয় সংস্কার তখনও গড়ে ওঠে নি। এইটি পরবর্তী কালের যোজনা। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের ধারা ও ধরন থেকে মনে হয়, তাঁদের সময় থেকেই এই উগ্রতার সূত্রপাত। আত্মশ্রেষ্ঠত্বাভিমান, পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, মোটামুটি এক ছাঁচের চিন্তার অনুবর্তিতা, রুচির সাম্য—এগুলি যদি আধুনিক দলীয়তার লক্ষণ হয়, তা হলে গত তিন দশকের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে এই অভ্যাসটির বিশেষ প্রসার ঘটেছে, স্বীকার করতে হয়। এখন তো বাংলা সাহিত্যে দলীয়তার জয়জয়কার। বিভিন্ন বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বী সাহিত্যিক দলগুলির পরস্পরের মধ্যে বিসম্বাদের অন্ত নেই। এ-দল ও-দলের লেখকদের তাক করে কথা ছোড়াছুড়ি চলছেই। অকারণ বিবাদ-বিতর্কের মালিন্যে সাহিত্যের আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠল। এ রকম বিমর্ষ আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যের শুভ অগ্রগতি সম্ভব নয়, বলাই বাহুল্য।

দলাদলির কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, আরও হবে যদি না ইতোমধ্যে তাকে প্রশমিত করার আন্তরিক চেষ্টা হয়। আমাদের কথা হল, সাহিত্য মাথা মিলিয়ে দল বেঁধে করবার কাজ নয় ; ওটি সর্বাংশে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রয়াসেরই ফল। সাহিত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্যানের শ্রেষ্ঠ মনোকুসুম। তবু সমাজ-জীবনে নানা কারণে মানুষের দল গড়বার প্রয়োজন হয় ; শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষেও দল গড়বার বাধা দেখি না। শুধু দেখা দরকার, এই দলবদ্ধতা যেন শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার হানিকর না হয়। নিজের

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে, অপরকে আঘাত না করে যদি সমান রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে মিলিত হওয়া যায় তাতে অনিষ্টের চাইতে হিতের সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু কোন অবস্থায়ই দলীয় উগ্রতা যেন প্রকাশ না পায়। পরিবার-জীবনে ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি বৈষম্যমূলক পরিচয়চিহ্ন ধারণ করা সত্ত্বেও যেমন সমাজ-জীবনে এক সাধারণ কর্মক্ষেত্রে মিলিত হবার পথে কোন বাধা নেই, তেমনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও লেখকের পক্ষে দল-নিরপেক্ষ উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব। শুধু উদার মনোভাবের কথাই বা বলি কেন, সাধারণ কর্মসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হবার পথেই বা বাধা কোথায়? সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার সাহিত্যের নিজস্ব মানদণ্ডে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ ক্ষেত্রে 'লেবেল'-এর পরিচয় অবান্তর। 'লেবেল'-মাফিক পরিচয় জুলুমের নামান্তর। লেখকের উপর দলীয় 'লেবেল' আঁটা যদি সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হয় তা হলে সাহিত্যের ভরাডুবি সুনিশ্চিত।

আজকাল এই দলীয়তার আঁচ লেখিকাদের গায়ে গিয়েও লেগেছে দেখতে পাই। কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে? লেখিকারাও মূলতঃ লেখক, কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের লেখক হিসাবে না ভেবে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ 'লেখিকা' হিসাবে ভাবতে শুরু করেন, তা হলেই বিপত্তি। সাহিত্যে এ জাতীয় ট্রেড-য়্যুনিয়নিজ্‌মের অবকাশ নিতান্ত সংকুচিত, এ কথাটা এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। লেখিকারা যখন 'লেখিকা' হিসাবে স্বীয় দাবি প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন, সেই দাবির মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতাই শুধু প্রকাশ পায়। এই হীনম্মন্যতার কোনরূপ বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে করি না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একাধিক লেখিকা তাঁদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায়, লীলা মজুমদার, চিত্রিতা দেবী প্রমুখ লেখিকাদের রচনার সমাদর হয়েছে। এই যেখানে প্রকৃত অবস্থা, সেখানে লেখিকা হিসাবে লেখিকাদের সংগঠনপ্রয়াসের তোড়-

জোড়ের কোন অর্থ হয় না। লেখিকাদের সম্পর্কে পুরুষ-সমালোচকদের প্রশংসাকার্পণ্য অনুমান করে নেবারও কোন ভিত্তি নেই। লেখক বা লেখিকা যিনিই হোন, তাঁর সাহিত্যের ভালমন্দের বিচার হবে তাঁর লেখার নিজস্ব গুণাগুণের দ্বারা, এই ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা অনুচিত। সেটি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। সাহিত্য ভেদবুদ্ধির কলুষমুক্ত উদার এক সার্বজনীন ক্ষেত্র, বৈষম্যচেতনার বীজ এই ভূমিতে উপ্ত না-ই বা হল!

সৎ সাহিত্য

সাহিত্যের ধর্ম, প্রকৃতি ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে এ যাবৎ অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

অবশ্য এ বিষয়ে সুনিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবও নয়। সাহিত্য জিনিসটাই এমন যে, নানা জন নানা কথা না বললে তার বৈচিত্র্য খোলে না। আর যেখানে বৈচিত্র্য সেখানেই বৈরূপ্য। পথ বিচিত্র হলে মতও বিচিত্র হতে বাধ্য। সাহিত্যপ্রসঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আশা করা যুক্তিসহ নয়।

কিন্তু মনে হয়, একটি ব্যাপারে অন্ততঃ সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ নেই। থাকা উচিত নয়। সেই বিষয়টিই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য।

যিনি সাহিত্যসেবী হবেন, তিনি তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্যিকই হোন আর তথাকথিত দক্ষিণপন্থী সাহিত্যিকই হোন, তাঁকে কটি বিষয়ে লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। দেখতে হবে, তিনি যে সাহিত্য পরিবেষণ করছেন তাতে পাঠকের রুচি ও স্বভাব উন্নততর হওয়ার মত মালমসলা আছে কি না, সে রচনা পাঠকের সৌন্দর্যস্পৃহা ও মানবতাবোধকে উদগ্র করে কি না, যেখানে সৌন্দর্যস্পৃহা ও মানবতাবোধ নেই, সেখানে তাদের জাগ্রত করে কি না। এই শর্ত যে লেখক পূরণ করতে না পারলেন, তিনি আর যা-ই হোন সাহিত্যস্রষ্টা নন।

প্রগতিপন্থীদের কাছে কথাগুলি হয়তো একটু সেকেলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাবের জগতে সেকেলে-একেলে বলে কোন কথা নেই। ও দুটি শব্দ দুর্বলের ওজর; লেবেল দিয়ে যাঁরা সাহিত্য বিচার করেন তাঁদের নজির! কিন্তু সত্য লেবেলের অপেক্ষা রাখে না। সত্যের মাপকাঠিতে সেকাল-একাল বিচার অবান্তর। 'সত্য' 'শিব' ও 'সুন্দর'—এ তিনটি কথা অবশ্যই বহু পুরাতন, কিন্তু তাদের প্রতি মানুষের মনে যে দুর্নিবার আকর্ষণ তা তো আর পুরাতন নয়, তা যে নিত্যকালের নূতন। এ কথা কি কেউ বলতে পারেন যে,

সত্য আমার স্পৃহণীয় নয়, মানব-কল্যাণ অবাঞ্ছনীয় কিংবা সৌন্দর্য আমার চোখে অশ্রদ্ধেয় ? যুগ থেকে যুগে সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণায় হয়তো কিছু রদবদল হয়েছে, কিন্তু মানব-মনের তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হিসাবে তারা কি আজও মানব-সভ্যতাকে ধরে রাখে নি ? মানুষের যে কটি আদর্শ মহত্তম মূল্যবোধের পর্যায়ে পড়ে এবং স্বতঃসিদ্ধ, সত্য শিব ও সুন্দর তাদের অন্তর্গত। নানাবিধ বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে তাদের মহিমা আজও অক্ষুণ্ণ। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের আদর্শবিবর্জিত জীবন কল্পনাও করা যায় না।

এ কথা যদি গ্রাহ্য হয়, তবে সত্য, শিব ও সুন্দর সর্বকালের সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত এ কথাও কেন গ্রাহ্য হবে না ? যে সাহিত্য বৃহত্তর পটভূমিতে সত্য ও মানবকল্যাণের আদর্শ প্রচার করে না, তাকে কেন আমরা গ্রহণ করব ? শুধু শ্রমিক-কৃষকের জন্য দরদ প্রকাশ করাই তো সব নয় ; শ্রমিক-কৃষক-দরদী হতে গিয়ে লেখক যদি পাঠকের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকেই কেবল জাগ্রত করেন, তবে তাঁর লেখার দাম কী ? নির্যাতিত অবদমিত মানবতার জন্য বেদনা ও মমতা-বোধে যদি খাদ না থাকে, তবে সত্য, শিব ও সুন্দরের চেতনায় অপহ্নব ঘটে না কোনদিন ; আর সে ক্ষেত্রে শ্রমিক-দরদও বিশেষ কোন রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে না। যদি দরদের পিছনে উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি থাকে, তবেই বেদনার সর্বজনীন রূপ অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক-দরদ ভাল, কিন্তু মানব-দরদ তার চাইতেও বড় জিনিস। শ্রমিক-দরদ সেখানেই শুধু শ্রদ্ধেয়, যেখানে তা বৃহত্তর মানব-দরদের অংশ ও অধীন। আর মানব-কল্যাণের বিরোধী শ্রমিক-দরদ দরদ-প্রকাশের নামে বিদ্বেষ-প্রচারের যন্ত্র বই কিছু নয়।

সুতরাং কথাটা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার যে, যে সাহিত্য মানুষকে সৎ করে না, সাধু করে না, সৌন্দর্যপ্রিয় করে না, সে সাহিত্য সাহিত্য নয়। এ কথা আজ জোর গলায় বলবার সময় হয়েছে যে, পরের ভাল করতে চাওয়াটাই জগতে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বিষয় নয় ; নিজের ভাল হওয়াটা তার চাইতেও বেশী জরুরি। নিজে ভাল হলে তবেই পরের ভাল করা যায়, নচেৎ

নয়। আমি যদি সৎ না হই, সত্যনিষ্ঠ না হই, তবে আমি পরের ভাল করব কিসের জোরে? কোন্ অধিকারে? বরং এ সব ক্ষেত্রে হিতের চাইতে অহিতই হয় বেশী। জনকল্যাণ-প্রয়াসের ছিদ্রপথে ব্যক্তিগত, কাতিপয়িক কিংবা গোষ্ঠীগত অধর্ম যৌথ অধর্মে পরিণত হবার সুযোগ পায়। নিষ্ক্রিয়তা বরং ভাল, তবু বিকৃতবুদ্ধিপ্রণোদিত উপচিকীর্ষা ভাল নয়।

এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। সৎ সাহিত্য মাত্রই মানুষকে সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তি-চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে সাহিত্য সম্মুখে এই লক্ষ্য স্থাপন করে না কিংবা এই লক্ষ্য যে সাহিত্যে প্রতিফলিত নয়, সে সাহিত্য অসাহিত্যজ্ঞানে পরিবর্জনীয়।

তথাকথিত নীতিবাদের প্রশ্ন এটা নয়। কিংবা উদারতম অর্থে নীতিবাদেরই এটা প্রশ্ন। খতিয়ে দেখতে গেলে, মানুষের সাহিত্যবুদ্ধি আর উচ্চতম নৈতিক বুদ্ধির মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। সাহিত্যে যাকে আমরা 'রস' আখ্যা দিই তা শুধুমাত্র হৃদয়বৃত্তিসম্বল নয়; মানুষের হৃদয়াবেগ, মনন, বুদ্ধি, এক কথায় মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে জড়িয়েই তার ক্রিয়া। যাঁর হৃদয়াবেগ প্রবল কিন্তু বুদ্ধি বিকশিত নয়, তাঁর সাহিত্যরস উপভোগে গলদ থাকবেই। আবার এর উল্টোটাও সত্য। হৃদয়াবেগশূন্য শুদ্ধমাত্র মননধর্মী ব্যক্তি পরিপূর্ণ সাহিত্যরস-আস্বাদনে অপারগ। অর্থাৎ যাঁর ব্যক্তিত্ব সব দিক দিয়ে বিকশিত নয়, তাঁর মধ্যে সাহিত্যের ক্রিয়া সম্পূর্ণ ফলবতী হয় না।

এখানেই উচ্চতম নৈতিক বুদ্ধির অপরিহার্যতা স্বীকার করতে হয়। উচ্চতম নৈতিক বুদ্ধি মানুষের দায়িত্বকে সব দিক দিয়ে বিকশিত করে তুলতে সহায়তা করে—তার চিন্তাপ্রণালী, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণকে মোটেই তা একপেশে করে রাখে না। শুধু ভাল হওয়া কিংবা অন্যায় না করার সদিচ্ছাটাই তো নীতিবুদ্ধি নয়, নীতিবুদ্ধির বৃত্ত আরও অনেক বেশী ব্যাপক। সৎ ভাব মাত্রই নীতিবুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে পড়ে—সে সৎ ভাব মননগতও হতে পারে, আবার সৃষ্টিধর্মীও হতে পারে। প্রতিটি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মূলে রয়েছে

সৎ ভাব, অথবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বললে, ভাবের সততা। উদ্দেশ্যের সততা এবং সদুদ্দেশ্য ছাড়া সৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সুতরাং পশ্চাতে উচ্চ নৈতিক বুদ্ধির পোষকতা না থাকলে সৎ সাহিত্যের জন্মদান কদাচ সম্ভব নয়।

সৎ সাহিত্য উপভোগের বেলায়ও একই কথা, আগেই বলেছি। অর্থাৎ লেখক এবং পাঠক উভয়েরই পক্ষে উচ্চতম নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাঠকের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা দ্বিমুখী। উচ্চতম নৈতিকবুদ্ধি পাঠককে সৎ-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে ; আবার সৎ-সাহিত্য-পাঠে পাঠকের নীতিবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হবে। মানুষ একই কালে পরিবেশ তৈরি করে এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়—এ অনেকটা সেই রকম।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আওতায় বড় হয়েছেন, এমন অনেককেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী বলে গর্ব করতে দেখি। তাঁরা যে রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন, এ কথা বলে তাঁরা এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁদের আচরণে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠের বিশেষ কোন সুফল প্রতিফলিত হতে দেখি না। কথাটা রূঢ় হলেও না বলে পারছি না যে, তাঁদের অধিকাংশেরই দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ও কর্ম সদ্বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা আর আর দশজনের মত নিতান্তই হিসাব-সর্বস্ব বাস্তববুদ্ধির দাস।

এর থেকে এই সিদ্ধান্তই অনুমেয় যে, হয় তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাল করে পড়েন নি, নয়তো রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহিরঙ্গটাকেই শুধু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য মন-প্রাণ দিয়ে পড়া থাকলে কখনই তাঁদের আচরণ এরূপ হতে পারত না।

এখানে বক্তব্য এই, রবীন্দ্র-সাহিত্য এত বড় একটা উচ্চাঙ্গের বস্তু যে, যিনি সেই সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করেছেন, তাঁর আচরণ শুভবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেই। বাস্তব-জীবনের আচরণ অবশ্য সব সময় আদর্শের অনুসারী হয় না ; আদর্শের ঘোষণায় এবং আদর্শের রূপায়ণ-প্রচেষ্টায় তফাত থাকতে বাধ্য। কিন্তু আদর্শ যেখানে বড়, সেখানে আচরণ তদনুপাতিক

না হলেও তদভিমুখী নিশ্চয়ই হবে। অন্ততঃ গড়পড়তা সাধারণ মানুষের ততোধিক গড়পড়তা আচরণের চাইতে যে সে-আচরণ বহুলাংশে শ্রেয়ঃ হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

কিন্তু কার্যতঃ কি আমরা তার খুব বেশী প্রমাণ পাই?

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই ধরা যাক। আজকের দিনের রুচি ও বিশ্বাসের মানদণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন রচনা প্রতিক্রিয়াপন্থী মনে হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে সকল আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এ যুগের বাঙালীর পক্ষে তার সবগুলি হয়তো গ্রহণীয় নয়। কিন্তু এ কথা তো মানতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাদর্শের পরতে পরতে সৌন্দর্যপ্রাণতা অনুস্যূত হয়ে আছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বইগুলির বিরুদ্ধে আধুনিকদের অভিযোগ সব চাইতে বেশী,—যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী', সেগুলির রচনার সৌন্দর্য কে অস্বীকার করবে? গ্রন্থত্রয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সদিচ্ছাকে কে খাট করতে সাহসী হবে? বর্তমান-কাল-প্রচলিত বামপন্থী ধ্যান-ধারণার নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে সংরক্ষণশীল কিংবা আর যে-আখ্যাই দেওয়া হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী পাঠকের মনে যে ভাবের গাঢ়তা সৃষ্টি করে, আজকের দিনের অধিকাংশ রচনাতেই তার অনুপস্থিতি প্রকট। পাঠকের কল্পনাকে উচ্চকিত করতে, সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধকে জাগ্রত করতে বঙ্কিম-রচনার তুলনা হয় না।

দয়া করে আমাকে কেউ সাহিত্যে পুরাতনপন্থী ভাববেন না। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ ফিরে আসুক, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আজকের দিনে যিনি বঙ্কিমের রচনাদর্শের অনুকরণে কিছু লিখতে যাবেন তাঁর কপালে লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু তাই বলে এ যুক্তিরও কোন দাম নেই যে, আধুনিক সাহিত্যিক হলেই তাঁকে বহুকাল-লালিত সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণাগুলি বিনিঃশেষে বিসর্জন দিতে হবে। প্রগতিবাদের অর্থ পুরাতন সৎ ভাবগুলি বরবাদ করা নয়। পুরাতন সৎ ভাবগুলি গ্রহণ ও জীর্ণ করে তার পরিধিকে বিস্তৃততর করার মধ্যেই সত্যকার প্রগতিবাদ

নিহিত রয়েছে। এ কথা যে লেখক না বুঝবেন তিনি নির্ভাঁজ বামপন্থী হয়েও কিছু করতে পারবেন না। তাঁর রচনা পাঠকের মনে বিতৃষ্ণ জাগাতেই শুধু সাহায্য করবে।

আজকের দিনের অনেক লেখকের লেখায় এবং একই লেখকের অনেক লেখায় কুলি-মজুর-ধাঙড় প্রভৃতি নির্যাতিত চিরবঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের দুঃখে সহানুভূতির অভিব্যক্তি দেখতে পাই। এই অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সহৃদয়তার অভাবে, কেমন একপ্রকার অসহিষ্ণুতার জন্য, এই-জাতীয় বেশীর ভাগ লেখাই মাটি হয়ে যায়। শ্রমিকের প্রতি মমত্ব প্রদর্শনের সদুদ্দেশ্যে যে রচনার শুরু, তা প্রায়ই শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ-পরিপোষিত আক্রোশ ও শ্রেণীবিদ্বেষ ছড়াবার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। রাজনীতি ও সাহিত্যে তখন আর বিশেষ কোন তফাত থাকে না। রাজনীতিতে polemics গ্রাহ্য হতে পারে (সত্যিই গ্রাহ্য কি না সে বিষয়েও আজ সংশয় দেখা দিয়েছে—গান্ধীবাদের অপরিসীম প্রভাবই এই সংশয়ের কারণ), সাহিত্যে কদাচ নয়।

সাহিত্যের সব চেয়ে বড় অন্তরায় যদি কিছু থেকে থাকে, তা হচ্ছে অন্তর্জ্বালা, দাহ ও আক্রোশ। যেই রচনায় তিক্ততার লক্ষণ ফুটে উঠল, অমনি তা সৎ-সাহিত্য-পদভ্রষ্ট হয়ে গেল। কেন না তিক্ততা শুধু লেখকের মনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা লেখনীমুখে পাঠকের হৃদয়েও সংক্রামিত হয় এবং তাঁর চিত্তকে প্রায়শঃ নিম্নাভিমুখী করে। এ রকম রচনার উদ্দেশ্য শেষ অবধি পরাজিত হয়। আধুনিক লেখকদের রচনায় নির্যাতিত ও শোষিতের প্রতি সমবেদনার যে অভিব্যক্তি, তা সম্পূর্ণ আন্তরিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আন্তরিকতা বিপথগামী হচ্ছে কি না সেইটেই প্রশ্ন। সমাজের একাংশের মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে বৃহত্তর অমঙ্গলকে ডেকে আনা হচ্ছে কি না সেটি এই প্রসঙ্গে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। সত্যবিবর্জিত মঙ্গলপ্রয়াস পরিণামে বহু অনর্থের কারক হয়ে থাকে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে উপচিকীর্ষার ভিত্তি, তা কদাচ সুফলপ্রসূ হয় না।

সাহিত্যে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা বলবেন যে, সৎ সাহিত্যের কোন বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। আজকের মানদণ্ডে যা সৎ সাহিত্য, কালকের মানদণ্ডে তা সৎ সাহিত্য না-ও থাকতে পারে। পরিবর্তনই সাহিত্যের ধর্ম। এক যুগের সাহিত্য অপর যুগে উপেক্ষিত হয়েছে তার বহু নজির আছে।

কথাটা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। সাহিত্যের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যা সর্ব-কালের সৎ সাহিত্যের প্রতিই প্রযোজ্য। নইলে সাহিত্যে আর পাটোয়ারী দলিলে কোনও তফাত থাকত না। অদ্যাবধি সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দয়া মায়া প্রেম স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাত্মক এবং তাদের বিপরীতগুণাত্মক হৃদয়বৃত্তিগুলি। বস্তু ঠিকই আছে, শুধু ভঙ্গীটা বদলেছে মাত্র। এক যুগের সৎ সাহিত্য যে আর এক যুগে অবজ্ঞাত হয় তার কারণ সৎ সাহিত্যের দোষ নয়, নূতন যুগের মানুষের মনোভঙ্গীর দোষ। বণিক্-বুদ্ধি ও আদর্শবাদের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্বারা যদি কোন একটি বিশেষ যুগের মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সে যুগের মানুষ অপর যুগের সৎ-সাহিত্যের প্রতি কখনও শ্রদ্ধাশীল হয় না। শুধু তাই নয়, সে যুগের নিজস্ব সাহিত্যেও বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় না। অবশ্য, এ-গ্রন্থ কি ও-গ্রন্থকে সৎ সাহিত্য বলে চালানোর চেষ্টা হতে পারে ; কিন্তু মনে রাখা দরকার, সাহিত্য-বিচারে সাময়িকতার রায় সব সময় নির্ভরযোগ্য রায় বলে গণ্য হয় না। সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে কালকে মধ্যস্থ মানাই যুক্তিযুক্ত পন্থা, কেন না কাল নিরপেক্ষ, মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি আস্থাশীল এবং সাময়িক রুচি ও বিশ্বাসের অনধীন।

তবু বণিক্‌যুগেও এমন পাঠকের দেখা মেলে যাঁর চোখে যুগান্তরের সৎ সাহিত্যের মূল্য ঠিক ধরা পড়ে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে চিরন্তন মানবীয় সত্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেইটেই কোন-না-কোনও এক সময়ে বলে দেয় কোন্ সাহিত্য গ্রাহ্য, কোন্ সাহিত্য অগ্রাহ্য। তা যদি না হত, প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সৎ সাহিত্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকত না।

সংশয়ীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, চিরন্তন মূল্যবোধ বলে কিছু আছে কি না? সত্য কি স্থির? সে কি একটি স্থাণু পদার্থ? এক যুগ থেকে আর এক যুগে বিবর্তনমুখে সত্যের ধারণায় কি পরিবর্তন হয় না?

তার উত্তর এই যে, ছোটখাট সত্যের ধারণায় হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়; কিন্তু মহত্তম সত্যগুলির প্রকৃতি স্থির থাকে। এমন কতকগুলি সত্য আছে যেগুলি সর্বকালের জন্য অলঙ্ঘনীয়, সর্বদেশের মানুষের পক্ষে গ্রহণীয়। তাদের অভ্রান্তত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

জাতীয় সাহিত্য

সমগ্র জীবন নিয়ে সাহিত্যের অনুশীলন; জীবনের কোন একটা বিশেষ দিক নিয়ে নয়। আত্মবিকাশের যত বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে তার সবগুলিকে নিয়েই সাহিত্যের পরিধি এবং পূর্ণতা। রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, সৌন্দর্যনীতি—এগুলি জীবনের এক-একটা খণ্ডিত অংশ। কিন্তু সাহিত্য সব-কিছুর মিলিত আবেদন দিয়ে গড়া একটি অখণ্ড সত্তা। বিভিন্ন আবেগের রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার ফলে সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড পুষ্ট।

ঠিক এই অর্থে বিচার করলে জাতীয় সাহিত্য বলে কোন আলাদা কথা হতে পারে না। যথার্থপদবাচ্য সমস্ত সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য এবং একই কালে তার আবেদন সার্বভৌম। সাহিত্যের অঙ্গনে জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতায় খুব বেশী তফাত নেই। থাকলেও সেটা শুধু বিশ্লেষণবাদীর দৃষ্টিতে ধরা পড়বার মত বিষয়, রসানুসন্ধানীর চোখে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেরই এক-একটা বিশেষ যুগকে খণ্ডিতভাবে বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, সেই বিশেষ যুগের সাহিত্যে জাতীয় চিন্তা ও চরিত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা পরিস্ফুট হয়েছে যার সাহায্যে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, এই যুগটি অন্য আর একটি যুগ থেকে পৃথক এবং এই এই বিষয়ে পৃথক। শুধু দুটি ভিন্ন যুগের মধ্যে পার্থক্যবিচারেই নয়, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যবিচারেও এই প্রক্রিয়া অনুরূপ ফলপ্রদ।

এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে যে বিশেষ লক্ষণ প্রকট হয়েছিল তা হচ্ছে অপরিমেয় প্রাণচাঞ্চল্য। মধ্যযুগীয় অন্ধকারের ঘোর কেটে যেতে ইউরোপের মানুষের চিন্তা ও আবেগ জড়তার নির্মোক ছেদন করে যখন বিচিত্র পথে বিচিত্র ধারায় অভিব্যক্ত হতে থাকল, সেই অমিত চাঞ্চল্যের দোলা এলিজাবেথীয় সাহিত্যের ঠিক মর্মের মাঝখানটিতে এসে লাগল। অত্যন্ত

বিধিবিধানের নাগপাশ থেকে চিন্তাধারার মুক্তি এবং গৃহের সঙ্কুচিত সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় কর্মের ব্যাপ্তি—এই দুই প্রকার স্বাধীনতার জয়গাথায় এলিজাবেথীয় সাহিত্য মুখর। কিন্তু পরবর্তী যুগে ক্রমওয়েলের স্বৈরনীতি ইংরেজী সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে গেল। তাঁর অনুগামীদের অতিমাত্রিক নৈষ্ঠিকতার হিম-শীতল স্পর্শে ইংরেজী সাহিত্যে বিশুষ্ক, নিরাবেগ বিচারবাদী রচনারীতির প্রবর্তন হল এবং এই ধারা ভিক্টোরীয় যুগের সূচনাকাল পর্যন্ত চলল। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যের অন্য চেহারা। সামন্ততন্ত্র ও ভৌমিক আভিজাত্যের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিপ্লবের অমিত সম্ভাবনা তখন ইংলণ্ডের মানুষের মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনিতে ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাহাত্ম্যে অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস ও অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ের বাণী সমগ্র ভিক্টোরীয় সাহিত্যে এমন একটা সুর এনে দিয়েছে যাকে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য যুগের সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলি থেকে নিঃসংশয়ে আলাদা করে দেখা চলে।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা চণ্ডীদাসের কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরাধিক কালকে তিনটি সুস্পষ্ট রেখায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়টি হল বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যায়, ভাগবত প্রেম ও ভক্তিবাদ যার মূল কথা। চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত এই অধ্যায়ের বিস্তৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল মঙ্গলকাব্যের যুগ। এই যুগের প্রধান লক্ষণ হল গার্হস্থ্যধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচার। গৃহী-সংসারীর পার্থিব সুখ-দুঃখের অনুভূতি এই যুগে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে, অথচ গৃহস্থের ধর্মপ্রাণতাকেও অমর্যাদা করা হয় নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী দেবীমাহাত্ম্যকীর্তনমূলক কাব্য হলেও তৎকালীন বাঙালী গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্রটুকু তার ভিতর কী সুন্দর ভাবেই না প্রতিফলিত হয়েছে! মঙ্গলকাব্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একেবারে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের যুগের প্রান্তে এসে লেগেছে। যুগটাকে

আরও প্রসারিত করে ধরতে যদি বাধা না থাকে, তা হলে কবি ঈশ্বর গুপ্তকেও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তে এসেই আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন ধারা শেষ হয়ে গেল; তিনি নূতন ও পুরাতন কালের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্যাপকভাবে বিচার করতে গেলে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এই যে অনধিক দেড় শত বৎসর, এইটেই বাংলা সাহিত্যের জাতীয় অধ্যায়। চাকার ভিতরে যেমন চাকা থাকে, নাটকের অভ্যন্তরে যেমন নাটক থাকে, তেমনি এই সুদীর্ঘকালস্থায়ী জাতীয় সাহিত্যের অভ্যন্তরেও আবার জাতীয়তামূলক কতকগুলি বিশেষ যুগ আছে এবং জাতীয় ভাবোদ্দীপক কতকগুলি বিশেষ রচনা আছে। একটু পরেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করার অবকাশ আমাদের হবে, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রামমোহন থেকে যখন এই যুগের সূত্রপাত, তার থেকে স্বভাবতঃই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা চলে যে, বাংলার জাতীয় সাহিত্যের অধ্যায়টি সাক্ষাৎভাবে ইংরেজ ও ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শ ও সংঘাতজনিত প্রভাবের ফল। এ-দেশে ইংরেজের আগমন না ঘটলে, আমাদের চেতনায় জাতীয়তার উন্মেষ হত কি না সন্দেহ।

সুতরাং ইংরেজ-আগমনের পর আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ ও পরিপুষ্টি, সেইটিকেই জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। এই বিচারে রামমোহন থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তা-ই জাতীয় সাহিত্য। কিন্তু বিষয়ের এরূপ সরলীকরণ বাঞ্ছনীয় নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র সেই সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকের রচনাবলীর উল্লেখ করা, যাঁদের লেখার মধ্যে আর সমস্ত লক্ষণকে অতিক্রম করে জাতীয় ভাবোন্মাদনা প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে; কিংবা রচয়িতাদের একটা বিশেষ রচনাকালে জাতীয়তার লক্ষণটি সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

রামমোহন রায়কে দিয়ে এই তালিকার শুরু। রামমোহন শুধু যে একটা নূতন যুগের সূচনার স্রষ্টা হিসেবেই শ্রদ্ধেয় তা নয়, যে যুগকে তিনি সৃষ্টি

করলেন তার বিচিত্র সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতার প্রতিটি বীজ তিনি স্বহস্তে রোপণ করে গিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে এবং কী মর্ম পরিবেষণ করবে তার আভাস এই যুগস্রষ্টার রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ, কিন্তু দেশপ্রেম মাত্র বিদেশীকে ভারতভূমি থেকে তাড়াবার ছলাকলা নয়, দেশ-হিতৈষণা দেশের নিষ্ক্রিয় হিতকামনা মাত্র নয়। যে সকল সংস্কার, বিশ্বাস, অভ্যাস আমাদের মনকে পঙ্গু করে রেখেছে, আমাদের যদৃচ্ছা বিকাশের স্বাধীনতাকে সহস্র কৃত্রিম বিধিনিষেধের জালে সঙ্কুচিত করে রেখেছে এবং পরিণামে জাতির শক্তি ও উদ্যমকে ফলপ্রদ হতে দিচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করাই হল সত্যিকারের দেশপ্রেম। এই অর্থে রামমোহন রায়ের রচনাতেই আমরা প্রথম দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন—এর সোজা অর্থ তিনি বাঙালীর মন থেকে তার অভ্যস্ত চিন্তার জড়তা ঘুচিয়ে তাতে বিচারবুদ্ধির আলো ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। রামমোহনের বিদ্রোহ অন্ধ আচারের বিরুদ্ধে সচেতন বিচারক্ষমতার বিদ্রোহ; মেরুদণ্ডহীন আবেগের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মননের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের দ্বারাই তিনি বাঙালী জাতির চিত্তে প্রথম জাতীয়তার বীজ রোপণ করে গেলেন। সতীদাহ-প্রথানিরোধ, কিংবা স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের উদ্যম প্রভৃতি রামমোহনের সমাজ-সেবামূলক কাজগুলি এই বিদ্রোহেরই রূপান্তরিত ফল মাত্র।

তার পরেই প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম করতে হয়। কিছু শিক্ষামূলক পুস্তক ব্যতীত সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমন কিছু রচনা না করলেও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই যে, ভাষার ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা এবং সেই দিক দিয়ে বাংলা গদ্যের বুনিয়াদ তৈরীর অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁর। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচণ্ড বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ কর্মের মধ্য দিয়েই অধিকতর প্রকটিত হয়। রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন নি।

বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর যে সমস্ত সন্দর্ভ আছে সেইগুলিই এ বিষয়ে একমাত্র উল্লেযোগ্য নজির। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যদি মাত্র একটি মানসিক অভীপ্সা না হয়, কর্মই যদি তাঁর মর্মকথা হয়ে থাকে, তা হলে দেশবাসীর চিত্তে জাতীয় চেতনা সঞ্চারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান যে অনেকখানি সে কথা কে অস্বীকার করবে?

তারপরেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। মাইকেলের বাইরেটাই শুধু বিজাতীয় ছিল; কিন্তু অন্তরে তিনি জাতীয় ভাবধারার আদর্শের দ্বারা একান্তভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর জাতীয় ভাবোন্মাদনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বাহিরের আক্রমণ থেকে লঙ্কাপুরীকে রক্ষার গভীর আকূতি এই কাব্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মাইকেল জন্মবিদ্রোহী—আচারে, আচরণে, প্রবৃত্তিতে ও বিশ্বাসে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মাইকেলকে পাশ্চাত্ত্য ভাবাচ্ছন্ন মনে হলেও মাইকেল কোন কালেই সামগ্রিক জাতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। জাতীয় ঐতিহ্যের যে যে অংশ তাঁর ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বোধ হয়েছে মাত্র সেই সব অংশের বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি নির্বিচার জাতীয়তাবাদী ছিলেন না; জাতীয়তার ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্ম নির্বাচনপন্থী ছিলেন—গ্রহণ-বর্জনের নীতি তিনি মানতেন।

জাতীয়তার আদর্শের ভিতর প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম যথার্থ স্রষ্টা। ইংরেজী ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে অনেক গলদ, অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করতে না পারলে শুধু যে আমরা অশ্রদ্ধেয় হয়ে থাকব তাই নয়, আমাদের বহুপ্রার্থিত স্বাধীনতাও নাগালের বাইরে থেকে যাবে। তাই তিনি ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক জোর দিলেন এবং এই দিক দিয়ে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে আদর্শ চরিত্ররূপে জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে বিবিধ বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। তাঁর

মধ্যে আমরা আবেগ ও মনন, চিন্তা ও চেষ্টা, সংসারজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, কর্মনীতি ও ধর্মনীতিমূলক আচরণ একই কালে বিধৃত দেখতে পাই। আধুনিক-পুরাতন আর কোন মহাপুরুষের চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রের এই সমন্বয়ের আদর্শটিকে জাতির পক্ষে একমাত্র গ্রহণীয় নীতি বলে নির্দেশ দিলেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসামান্য ঝোঁক যে তৎকাল-প্রচলিত ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দ্বারাও অনেকটা পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল তার নজির তাঁর রচনাবলীতে আছে। মিল-বেন্থামের হিতবাদের প্রথম ভারতীয় শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র ব্যষ্টির কল্যাণের সর্বসাকুল্য ফলটাকে সমষ্টির কল্যাণ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারার নিরিখে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন প্রচেষ্টার উপর জোর দিতে গিয়ে যৌথ প্রচেষ্টার মহান সম্ভাবনাকে কিয়ৎ-পরিমাণে উপেক্ষা করেছেন। তবে এ কথা বলা চলে না যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। সমষ্টিবদ্ধ প্রচেষ্টার অশেষ মঙ্গলকর দিক আছে, কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রটি যদি অশোধিত থাকে তা হলে যৌথ প্রচেষ্টায় কোন ফলই হয় না, বরং তাতে উল্টো ফল দেখা দেয়। এইজন্যই ব্যক্তিগত নৈতিক শুদ্ধির এত প্রয়োজন। এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিক যুগের গান্ধীজি-প্রচারিত আদর্শ ও বঙ্কিমের আদর্শের ভিতর মূলগত কোন প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে রস পরিবেষণ করেছেন তা শুদ্ধমাত্র শিল্পরস নয়। দেশবাসীকে জাতীয় ভাবধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তোলা তাঁর সাহিত্যজীবনের অন্যতম প্রধান সাধনা ছিল, এবং এই অঙ্গীকারে তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্র উদ্দীপিত ছিল। নিছক জনচিত্তহারী গ্রন্থ রচনার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন নি, সে কাজ আর কেউ করলেও পারতেন। 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'দেবীচৌধুরাণী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' প্র ভৃতি উপন্যাসের উপজীব্য দেশাত্মবোধ ; তেমনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের মূল অভিপ্রায় সমাজসংস্কার। এই দুটি প্রেরণাই যে জাতীয়তাবাদের উৎস থেকে উচ্ছ্রিত হয়েছে তা না বললেও চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজসংস্কারের প্রেরণাটুকু হয়তো আজকের দিনের বিচারে যথেষ্ট প্রগতিশীল নয়; কিন্তু এই সংস্কার-কামনার পিছনে যে মন লুকিয়ে ছিল তার উদ্দেশ্যের সততাকে সন্দেহ করা চলে না। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য' কিংবা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর পরিহাস-রসিকতাগুলি আচ্ছাদন মাত্র; তার ভিতর দিয়ে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারের কথাই তিনি বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে, সমসাময়িক কাল ও পরবর্তী যুগে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক প্রবন্ধকার নাট্যকার সাংবাদিক বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে জাতীয়তা পরিবেষণ করে গেছেন তাঁদের ভিতর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলার ঊনবিংশ শতকের অনেক চিন্তানায়কের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ও অধ্যাত্মবাদী অনুভূতি অভিন্ন ছিল। ধর্মীয় সাধনার পথে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশকেই এঁরা জীবনের সার বলে জেনেছিলেন। আজকের দিনে জাতীয়তাকে আমরা ধর্মীয় বিধিবিধানবিরহিত একটা লৌকিক প্রেরণা বলে মনে করি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশে এই ধারণা গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল না। ঐশী প্রেরণা ও ধর্মীয় আচরণ দ্বারা আত্মোন্নয়নের অভীপ্সা তখনকার সমাজ-প্রধানদের হৃদয়বৃত্তি ও মননের সহিত অভিন্নভাবে জড়ানো ছিল। ফলে অনেকের রচনাতেই জাতীয়তা ধর্মীয় অনুভূতির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম

উল্লেখযোগ্য। আবার এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রেরণার প্রবলতার জন্য তো বটেই, ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে Doctrinaire Socialism-এর বাইরে সমাজবাদ প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টার উদ্বোধক হিসাবেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী বাংলা জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

নাট্যসাহিত্যে জাতীয়তার পথপ্রদর্শনকারী রচনারূপে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্যপক্ষে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবি নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক রচনা হিসাবে সবিশেষ মূল্যবান।

গোটা উনিশ শতক ধরে জাতীয়তার বেদীমূলে বাঙালী কবি, সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তবে সে জাতীয়তার প্রকৃতি মূলতঃ নিষ্ক্রিয়—মনন ও হৃদয়াবেগের মধ্যেই তার প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ। তার ভিতর সংগ্রামের আবেগ নেই। সংগ্রামের ভিত্তিতে সত্যিকার সক্রিয় জাতীয়তার স্ফুরণ হল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ-নিরোধ আন্দোলনের সূচনায়। কর্মপ্রয়াসমণ্ডিত এই নূতন জাতীয়তাযজ্ঞের ঋত্বিক ও হোতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক বিচারে এই নূতন জাতীয়তার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিল। ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং তারও আগে সুরেন্দ্রনাথ-কর্তৃক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন চেষ্টার মধ্যে এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাঙালী কৃতী সন্তানেরা নবজাতীয়তার প্রথম সূত্রধর। তবে এঁদের প্রবর্তিত জাতীয়তা গোড়ার দিকে নিতান্তই আবেদননিবেদনসম্বল ছিল; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স।" কিন্তু ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারিতাপ্রসূত বঙ্গখণ্ডনের ঘোষণার ফলে ভদ্রলোকের পলিটিক্স সম্পূর্ণ

নূতন রূপ পরিগ্রহ করল—জাতীয় দাবী ক্ষীণকণ্ঠ পোশাকী ভাষার আশ্রয় ত্যাগ করে বজ্রনির্ঘোষে গর্জে উঠল। বিদ্রোহের আভায় জাতীয়তাবাদীদের মুখাবয়ব রক্তিম আকার ধারণ করল, দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্যোতনায় তাঁদের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র রচনায় ও বাগ্মিতায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ ঘোষ যথাক্রমে 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে অগ্নিগর্ভ স্বাদেশিকতার প্রচারে এবং রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চারে বাঙালীর চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সূত্রপাত করলেন।

সাহিত্যের বিচারে এঁদের ভিতর রবীন্দ্রনাথের দানই শ্রেষ্ঠ। জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা তিনি দেশে একটি নূতন ভাবের বন্যা বইয়ে দিলেন। বাঙালীর চিত্তে জাতীয় চেতনা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করতে তাঁর স্বদেশী গান যে কতভাবে সাহায্য করেছে তা বলে বোঝানো যায় না।

কিন্তু মাত্র স্বদেশী সঙ্গীতের মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবের চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্যের সাধনা জাতীয় সাহিত্যের সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু বঙ্গভঙ্গনিরোধ-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় একটি বিশেষ কালে তা অতিমাত্র তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার স্বরূপ কী? আমাদের প্রাচীন সভ্যতা আর আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর যা কিছু মহৎ বরণীয় শ্রদ্ধেয়, তার সমন্বিত ফল কবির কল্পনায় এক বিরাট সম্ভাবনারূপে প্রতিভাত হয়েছিল এবং দেশবাসীর সমক্ষে তিনি সেই সমন্বয়ের আদর্শকেই একমাত্র গ্রহণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী স্বজন ও স্বগৃহের সীমা অতিক্রম করতে চায় না, তেমন জাতীয়তাবাদের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল না। এক বিরাট, বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-জাতীয়তার মধ্যে মুক্তিসন্ধান করুক, এই ছিল তাঁর কাম্য। জীবন-সায়াহ্নে "সভ্যতার সঙ্কট" প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি যে কঠোর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন,

প্রথম দৃষ্টিতে তাকে তাঁর চিরপোষিত আন্তর্জাতিকতার আদর্শের পরিপন্থী মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি "পূরব পশ্চিম"-এর মিলনে কখনও আস্থা হারান নি; তাঁর লেখনীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শক্তিমদমত্ততার, তার সর্বগ্রাসী লোভাতুর ক্ষুধার রূপটিই শুধু ধিকৃত হয়েছিল। কবি বুঝেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত, আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে তাকে গৃহ-প্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যে সঙ্কুচিত করলে তা আত্মখণ্ডনেরই সমতুল হবে। জাতীয়তা কিংবা স্বাদেশিকতার অর্থে শুধু বিদেশীর দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের চেষ্টাই বোঝায় না; সর্বপ্রকার মিথ্যা আচার, সংস্কার, চিন্তা ও অভ্যাসের দাসত্বমুক্ত স্বাধীন প্রেরণার নামই সত্যকার জাতীয়তাবাদ। এই প্রেরণার বলে বলীয়ান মানুষ একই কালে খাঁটী দেশজ ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক শুভবুদ্ধির ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী কালে যাঁরা কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবেই জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি দেশবাসীর চিত্তে জাতীয়তার উন্মেষে বহুলপরিমাণে সহায়তা করেছে। ক্ষুরধার ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে মোহগ্রস্ত জাতীয় বিবেককে কষাহত করে তাকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিও কম কাজ করে নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত অগ্রণী। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানমূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রজনী গুপ্ত (সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস) ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশিম) পুরোবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিতগণ বাদে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, যোগীন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখনীয়। জাতীয় সঙ্গীত

প্রচারে দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের পর কবি অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবি অজয় ভট্টাচার্যের দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

গান্ধীজীপ্রভাবিত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অধ্যায়ে (১৯২১—১৪ই আগস্ট ১৯৪৭) বাংলা দেশে জাতীয়তার প্রচারপ্রচেষ্টা দুটি সুস্পষ্ট ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে—রাজনৈতিক সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য। রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আধুনিক সংবাদপত্রসেবাকেও যুক্ত করতে হবে। নূতন পর্যায়ের স্বাধীনতাসংগ্রামে রাজনৈতিক সাহিত্যপ্রচারের মূলে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম প্রভাব। কতিপয় শক্তিশালী সাংবাদিকের লেখনী এই দুইজন বিশিষ্ট নেতার প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনার ফলেই সুতীক্ষ্ণ ও অপ্রতিরোধ্য হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সাহিত্যও এই কালে কম রচিত হয় নি। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস, দেশী ও বিদেশী দেশভক্ত সংগ্রামী বীরদের জীবনী, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কীর্তি ও মতবাদ আলোচনা, মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদের অনুশীলন, কৃষক ও শ্রমিকের কর্মতৎপরতামূলক সাহিত্য, সমাজতন্ত্রী সাহিত্য, বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতিকে এই অধ্যায়ের রাজনৈতিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

আধুনিক সাহিত্যের ভিতর গোড়ার দিকে জাতীয়তার চেতনা নিতান্ত ক্ষীণ ছিল। অনেকখানি ফাঁকি ও মেকী নিয়ে কল্লোল-কালিকলম পর্যায়ের আধুনিক সাহিত্যের পথপরিক্রমা শুরু হয়েছিল। সুখের বিষয়, বয়স ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকেরা তাঁদের প্রাথমিক ভুল কিছু-পরিমাণে কাটিয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া কতিপয় জাতীয়তাবাদী শক্তিশালী নূতন লেখকের আবির্ভাবের ফলেও সাহিত্যের আবহাওয়া পরিশোধিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ শক্তিশালী লেখকবৃন্দের রচনার ধারার ভিতর জাতীয়তার আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের সাহিত্যপ্রয়াসের দ্বারা

কল্লোলাশ্রয়ী লেখকদের বিজাতীয় বিকার অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধকালের ভিতর যুদ্ধজনিত বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে, বিশেষতঃ ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ভিত্তিতে, বাংলা ভাষায় কতকগুলি প্রথমশ্রেণীর সাহিতগ্রন্থ রচিত হয়েছে। আগস্ট-বিপ্লবকে আশ্রয় করেও সৎসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্তই শুভলক্ষণ। আরও একটি শুভলক্ষণ এই যে, বাংলা সাহিত্যের উপর থেকে কৃত্রিম দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব—যা এককালে সাহিত্যকে প্রায় গ্রাস করতে বসেছিল—ক্রমেই তিরোহিত হচ্ছে। (কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সুস্থ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কেউ গুলিয়ে ফেলবেন না।) ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে বাংলা সাহিত্যে নূতন পর্বের সূচনা হয়েছে। সে পর্বের বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সাহিত্যনির্মাণশালা

'সাহিত্য' কথাটা আমরা খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। দলিল-দস্তাবেজ, আপিস-আদালতের চিঠিপত্র, ব্যবসায়িক পত্রালাপ, নীলামের ইস্তাহার, বিজ্ঞাপনী হ্যাণ্ডবিল, লিমিটেড কোম্পানির প্রস্পেক্টাস, বীমা-কোম্পানির পুস্তিকা, সরকারী প্রেসনোট, সংবাদপত্রের মামুলী রিপোর্ট, ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি স্বাস্থ্যতত্ত্ব উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদির পাঠ্যপুস্তক, নানাপ্রকার বাজারচলতি অর্থপুস্তক, ল-রিপোর্ট, পঞ্জিকা ও নিত্যকর্মপদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি বাদে আর যা-কিছু আমরা রচনা করি তাকেই 'সাহিত্য' এই ঢালাও নামে অভিহিত করবার একটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু সংজ্ঞার্থের এই ব্যাপ্তির দ্বারা সকল স্তরের এবং সকল দরের রচনার প্রতি হয়তো আমরা উদার মনোভাবের পরিচয় দিই ; তবে সেই উদারতার ছিদ্রপথে যথার্থ সাহিত্যের প্রতি অবিচার ঘটে কি না তা ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে।

'সাহিত্য' কথাটার যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংস্কৃতে পাই তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চললে সাহিত্যকর্মের পরিধি ও বিস্তার স্বতঃই অনেকখানি পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। হিতের সহিত যাহা বর্তমান তাহা 'সহিত', এবং এই সহিতত্ব যে রচনায় উপস্থিত তাহাই সাহিত্য। অর্থাৎ রচনাকর্ম নিছক রচনাকর্ম হলেই তা সাহিত্য হয় না, সাহিত্যপদবাচ্য রচনা কল্যাণভাবনাযুক্তও হওয়া চাই। বাজারে সাহিত্য নামে যা চলছে তার সবই যদি কল্যাণভাবনাযুক্ত হত তা হলে আর কথা ছিল না।

সাহিত্যে যাঁরা বিশুদ্ধবাদী তাঁরা এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, যা অপ্রয়োজনের সৃষ্টি, অবসরের আনন্দের সৃষ্টি, তা-ই সাহিত্য। সাহিত্য কেবলমাত্র তাকেই বলা হবে যা আত্মপ্রকাশের ঐকান্তিক আগ্রহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার পিছনে আনন্দিত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ রয়েছে।

তার পিছনে কল্যাণভাবনা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে; সেটি বড় কথা নয়। বলা বাহুল্য, এটি নন্দনবাদীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, যা এখন আর পুরাপুরি গ্রাহ্য নয়। অতি বড় অপ্রয়োজনের সাহিত্যের মধ্যেও প্রয়োজনের একটা তাড়না লুকিয়ে রয়েছে। সে প্রয়োজন লেখকের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষুধা, নিজেকে আর দশজন থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলবার ক্ষুধা। লেখক তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যে পরিমাণে আপনাকে দশের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন ঠিক ততটাই তিনি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা দশজন থেকে বিশ্লিষ্ট হবারও প্রয়াস করেন। একই সঙ্গে মিলিত এবং আলাদা হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতি সৎ-লেখকের ভিতর মজ্জাগত বললেও চলে। সাহিত্যের এ এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া—এই ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই বোধ লেখকের ভিতর কখনও প্রত্যক্ষ কখনও অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু ওটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করবার আদৌ অবকাশ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ অপ্রয়োজনের সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য নেই। গভীর আনন্দের লীলায় জাত সাহিত্যের মধ্যেও প্রয়োজনের বোধ অনুস্যূত হয়ে থাকে।

কিন্তু এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, এখনকার কালের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় সাহিত্যের পুরাতন নন্দনবাদী ব্যাখ্যা স্বতঃই পরিত্যাজ্য। নন্দনবাদী ব্যাখ্যার আর যে বিচ্যুতিই থাক্ এটি অন্ততঃ তার সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয়ভাবে বলা চলে যে, তার ভিতর আধুনিক কালোচিত উগ্র বৈশ্য মনোভাব নেই। হয়তো সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে অতি-বিশুদ্ধ অপ্রয়োজন আর আনন্দের সাহিত্যের মধ্যেও প্রয়োজনের অনুপ্রবেশ ধরা পড়বে, তা বলে সেই প্রয়োজনকে এখনকার কালের স্থূল ব্যবসায়িক প্রয়োজনের সঙ্গে কোনমতেই গুলিয়ে ফেলা চলে না। এখন তো লেখকেরা বই লেখেন এক চোখ কাগজের উপর রেখে—আর এক চোখ বইয়ের এডিশন-সংখ্যার উপরে স্থাপন করে। বই কাটবার সম্ভাবনা না থাকলে অতি নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী লেখকও আজকাল কাগজের উপর কলমের সামান্য আঁচড়টি কাটতে চান না। আর শুধু কি তাই, বই লিখে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলে এ যুগের অনেক লেখক হয়তো আদপে কলমই

ধরতেন না। তাঁরা আর কোন জীবিকায় ভাগ্য অন্বেষণ করতেন। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আজকের দিনের অধিকাংশ সাহিত্যিকের চক্ষে সাহিত্য একটা অর্থকরী জীবিকা বই কিছু নয়। আর দশটা জীবিকার মতই এর ধরনধারণ, পদ্ধতি-প্রকরণ। মামুলী বৃত্তিজীবী মানুষ যেমন তার বৃত্তির সাহায্যে জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করে, তেমনি সাহিত্যবৃত্তিজীবীও সাহিত্যকে নিছক জীবনধারণের, সম্ভবস্থলে বিত্তপ্রতিপত্তি অর্জনের উপায় জ্ঞান করতেই সমধিক অভ্যস্ত।

এই যেখানে মনোভাব, সে স্থলে সাহিত্য অত্যুগ্র ব্যবসাদারিতে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যবসাদারী মনোবৃত্তির জন্যই আজকাল সাহিত্য বলতে নানাবিধ রচনাকর্মকে বোঝায়। এর একটা মোটা অংশই প্রকৃত সাহিত্য-বিশ্লেষণের ধোপে টিকবে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যকে অতিব্যাপক, উদার অর্থে গ্রহণ করে আমরা যেমন সাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়েছি তেমনি তার গুণ সঙ্কুচিতও করেছি। খতিয়ে দেখতে গেলে, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশী। সাহিত্যের ভিতর যখন সহিতত্বের ধারণা বলবৎ ছিল, বলবৎ ছিল অপ্রয়োজনের আর বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ, সেই সময়ে সাহিত্যসৃষ্টির এমন পরিমাণস্ফীতি ঘটে নি সত্য, তবে তার উৎকর্ষের দিকটি অনেক বেশী সুরক্ষিত ছিল। স্থূল ব্যবসায়বুদ্ধি কিংবা অনিয়ন্ত্রিত অর্থকরী মনোবৃত্তির রূঢ় হস্তাবলেপে সাহিত্যের কলুষস্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা কম ছিল। সাহিত্যের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ছিল না বটে, তবে সৌন্দর্য ছিল। এখন অতি-পাইকারী সৃষ্টিপ্রাচুর্যের হিড়িক আর ডামাডোলের মধ্যে ভালমন্দের বিচার লোপ পেয়েছে, মুড়ি মিছরি একদরে বিকোতে শুরু করেছে। এখন সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, 'তৈরী' হয়, আর তা হয় যান্ত্রিক সাহিত্য-নির্মাণশালা থেকে। ঝুড়ি ঝুড়ি সাহিত্য পাঠকের মনোযোগের দরবারে নিত্য উপস্থাপিত হচ্ছে—পাইকারী হারে তাদের লেনদেন। এখনকার লেখক আর প্রকাশকদের হাবভাব কাজকারবার লক্ষ্য করলে ব্যলজাকের প্রথম জীবনের St. Aubin & Company নামধেয় সাহিত্য-কারখানার কথা মনে পড়ে যায়।

ব্যলজাক তাঁর এক সাহিত্যযশোপ্রার্থী বন্ধুর সহিত সম-অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এই কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। প্রকাশকের ফরমায়েশ অনুযায়ী নিত্য নতুন বই এখানে 'তৈরী' হত, ব্যলজাক সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় অনর্গল লিখে পাঠকদের চাহিদার যোগান দিতেন। অমিত ক্ষমতাশালী ব্যলজাকের সাহিত্যজীবন এইরূপ অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতা দিয়েই শুরু হয়।

ব্যলজাকের আমলের ওই রেওয়াজ এই একান্ত বৈশ্যধ্যানধারণা-প্রভাবিত আধুনিক যুগে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন লেখকদের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যলজাকের কারখানা ছিল নিছক দুইজনার চেষ্টায় গঠিত যুগ্ম প্রতিষ্ঠান ; এখনকার গোটা সাহিত্যের ক্ষেত্রটাই যেন একটা বিরাট কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। 'সাহিত্যের বাজার', 'বইয়ের বাজার' কথাগুলি যে আমরা প্রায়শঃ ব্যবহার করি এতেই প্রমাণ হয় যে, বাজারের মানদণ্ডে আমরা সাহিত্যের বিচার করতে আরম্ভ করেছি। সাহিত্য ব্যপদেশে আমাদের মুখে 'বাজার' কথাটির প্রয়োগ মোটেই আকস্মিক কিংবা কারণহীন নয়। সাম্প্রতিক সাহিত্যের হালচাল দেখে-দেখেই এই রকম একটি শব্দ আমাদের মনোভাবের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গেছে। আজকের দিনের লেখা বই আর-দশটা বাজারচলতি পণ্যের মতই একটা বিক্রেয় পণ্য। ক্রেতার রুচি আর চাহিদা অনুযায়ী এই পণ্যের বাজারের ওঠানামা। ভিতরে সারবস্তু যাই থাক্, বইকে যে যত সুদৃশ্য ভাবে সাজাতে পারেন তাঁর পণ্যের কাটতির সম্ভাবনা তত বেশী। ভিতর-ফাঁপা আপাতপাঠ্য অংশের উপর মলাটের যত জৌলুস আর অঙ্গসজ্জার যত চাকচিক্য, তত বেশী পণ্যের প্রচলন ও প্রসার। এ যেন রূপোপজীবিনীর মত অঙ্গসজ্জার আড়ম্বর দিয়ে যুগপৎ মানুষকে প্রলুব্ধ করবার এবং হৃদয়ের শূন্যতাকে ঢাকবার ঘৃণ্য প্রয়াস।

পাইকারী হারে মলাট-সাহিত্য সৃষ্টি করবার এই-যে এক অশ্রদ্ধেয় রেওয়াজ কিছুকাল হল বাংলা সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কোন লেখক কিংবা প্রকাশককে দোষ দেওয়া বৃথা। ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার দ্বারা সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত

হয় সকলের সম্মিলিত ইচ্ছা আর প্রবহমাণ যুগরুচির চাপে। এ কালের যুগরুচিটাই যেন পাইকারী সৃষ্টিকর্মের পক্ষপাতী। ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের ফলজাত সুন্দর কুটিরশিল্পের বদলে যেমন আজকাল মিলজাত দ্রব্যের উপরই সাধারণের পক্ষপাত বেশী, তেমনি সযত্ন অভিনিবেশের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম অপেক্ষা স্থূলতার চিহ্নমণ্ডিত চিন্তাবিমুখ সাহিত্যকেই যেন আজকের ক্রেতাসাধারণ আনুকূল্য দান করতে সমধিক তৎপর। এই-যে সমকালীন রুচির ফ্যাশান, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়তো করা যায়, কিন্তু সে সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার আশা অতি-অল্প। লেখকবিশেষ যতই সদিচ্ছাসম্পন্ন আর চিন্তাসমৃদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষপাতী হোন না কেন, তাঁর একার পক্ষে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্রোতকে প্রতিহত করবার আশা দুরাশা মাত্র।

এই বৈশ্যমনোভাবনিয়ন্ত্রিত যুগে সব মানুষেরই অপকৃষ্ট রুচির দিকে ঝোঁকবার একটা সহজ প্রবণতা আছে। এই প্রবণতা গড্ডলিকা প্রবাহের মত পাঠকসাধারণকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। পাঠকসাধারণের সঙ্গে প্রকাশক, সম্পাদক, পুস্তকবিক্রেতাও সেই স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয়, সূক্ষ্ম রুচির কৌলীন্যাভিমানী এমন যে বিদগ্ধ লেখক, তিনিও এই স্রোতের টান রোধ করতে পারছেন না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁকেও সম্মিলিত ফ্যাশানের জুলুমের চাপে আর দশজনার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে হচ্ছে। কেন না তিনি যদি প্রচলিত ফ্যাশানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, যত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই তিনি হোন না কেন তাঁর সেই প্রতিরোধ-প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা অল্প, বরং এ ক্ষেত্রে তাঁর একঘরে এবং পরিণামে সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক মনে হয়। এ যেন আর দশটা সিনেমাগৃহের নৈশ আলোকসজ্জার আড়ম্বরের বহর দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় প্রদর্শনীগৃহটিকে আলোর জেল্লায় জৌলুসময় করে দর্শকদের চোখ ধাঁধাবার করুণ প্রয়াস। কেউ আড়ম্বরবাহুল্য কমাবার প্রস্তাব করেন না, সকলেই বিকারগ্রস্ত প্রতিযোগিতার তাড়নায় একে অপরকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করছেন।

ফ্যাশান বড় জ্বালা। অতি-বড় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সময় সময় ওই বালাইয়ের নিকট নতি স্বীকার করতে হয়।

উপরে যে-সব কথা বলা হল তা মূলতঃ সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের দিকে চোখ রেখেই যে বলা হয়েছে বিচক্ষণ পাঠককে সে কথা বলে বোঝাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের একটা মোটা-পরিমাণ পাঠ্যবস্তুই (reading matter) পাইকারী হারে কথা সাজাবার খেলায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। কারখানার কারুনৈপুণ্যের মত এখানেও যে জিনিসটির উপর মূল্য আরোপ করা হচ্ছে তা হল কথার পর কথা গেঁথে একটা গল্প বা উপন্যাসের প্রাকার গড়ে তোলার নৈপুণ্য। শব্দ সাজানো নিয়ে এখানে কথা, সে শব্দসজ্জা দর্শনে স্ফীতকায়, ওজনে ভারী হলে তো আর কথাই নেই ; কিন্তু ওই শব্দাবরণের অন্তরালে অনুভূতির গভীরতা তথা চিন্তার সমৃদ্ধি আছে কি না সে বিষয়ে সন্ধান নেবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন না—না লেখক না প্রকাশক, না সম্পাদক না পাঠকসাধারণ।

আজকের কথাসাহিত্যের একটা ভূরিপরিমাণ অংশই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি মনোযোগপরায়ণ। অকিঞ্চিৎকরত্বে তার স্ফূর্তি। নিতান্ত খেলো, চটুল কাহিনীর অবলম্বনে উপন্যাসসৌধ উত্তুঙ্গ করবার দৃষ্টান্তই সমধিক। সৌধ বললাম এ কারণে যে, আকারে প্রকারে আয়তনে রচনার উচ্চতা কিংবা পৃথুলতার কিছু কমতি নেই, শুধু ভিত্‌টাই যা পলকা। একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের রাস্তায় দৈবাৎ দেখা হল, অন্নদাশঙ্করের কোন একটি উপন্যাসের ভাষায় চারচক্ষুর মধ্যে 'টেলিগ্রাফ বিনিময়' হল, ব্যস, দেখতে না দেখতে ওই সূত্র অবলম্বন করে কোন্‌-না একখানা পাঁচ শো পাতার উপন্যাস দাঁড়িয়ে গেল। কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের অনূঢ়া বয়স্থা শ্রমশীলা কন্যা শীতের সকালের রোদ্দুরে ছাতে বড়ি কিংবা শাড়ি শুকুতে দিতে গেছে, তার অজানুলম্বিত ভিজা খোলা চুলের মায়ায় বাঁধা পড়ে পাশের বাড়ির তিনবার বি. এ. ফেল-করা ছেলে চারবারের বার বি. এ. ফেল করবার জন্য প্রস্তুত হল—সেই নিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ। কিংবা গ্রামের গরিব ঘরের ছেলে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে গৃহ-

শিক্ষকতা করবার শর্তে শহরের কোন সম্পন্ন গৃহে আশ্রয় পেয়েছে, দিনের পর রাতের মত গৃহকর্তার কন্যাটির সঙ্গে ছোকরা মাস্টারমশায়ের প্রেম এ সকল ক্ষেত্রে অবধারিত জানবেন। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের দৌলতে আমাদের একালীন যুবক গৃহশিক্ষকেরা ছাত্রীদের পড়ান না, তাদের সঙ্গে শুধু ভালবাসার ফষ্টিনষ্টি করেন। উদীয়মান যুব-সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এই মনোভাবের প্রসার ঘটলে তার ফল কত অনিষ্টকর হতে পারে কথা-সাহিত্যিকেরা তা চিন্তা করে দেখেন না।

এ তো গেল তরুণ-তরুণীর মন-দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কিত কাহিনীর প্রসঙ্গ। যে সব লেখক নরনারীর হৃদয়গত ব্যাপার সম্পর্কে তেমন কৌতূহলী নন, সমাজের বহির্মুখী ঘটনাবহুল বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে সমধিক যত্নবান, তাঁরা আবার আর-এক জাতীয় ভ্রান্তির দ্বারা কবলিত হন। সমাজের খুঁটিনাটি বৃত্তান্তকে হুবহু বাস্তবানুগ ভাবে ফুটিয়ে তুলে তাঁরা তাদের দায়িত্ব সমাপন করবার চেষ্টা করেন। জীবনে মানুষকে বা ঘটনাকে যেমন-যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন তেমন-তেমন ভাবে তাকে সাহিত্যের পাতায় রূপ দিতে পারলেই তাঁরা মনে করেন রচনার সুর যথেষ্ট উঁচুতে তোলা হয়েছে, এ সম্পর্কে আর-কিছু করবার নেই। জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তবে ব্যবধান অনেকখানি। লেখকের কল্পনার শক্তি এই ব্যবধানের সৃষ্টি করে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসারী বিবৃতি বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের দিক দিয়ে যতই বিশ্বস্ত (faithful) হোক, লিপিকুশলতায় মণ্ডিত না হলে তাকে ফোটোগ্রাফির অধিক মর্যাদা দেওয়া যায় না। সমাজ-বাস্তবতার (Social Realism) আদর্শে আমাদের আস্থা আছে, তাই বলে শিল্পসৌন্দর্যবিরহিত কঙ্কালমাত্রসার তথ্যনিষ্ঠায় আমাদের আস্থা নেই। রচনার উপজীব্য ঘটনা বা চরিত্রচিত্রণের পশ্চাতে যদি বক্তব্যের গভীরতা না থাকে, লেখকের হৃদয়বত্তা তথা আদর্শবাদ ও মননশীলতা যদি রচনাকর্মকে স্পর্শ না করে, তা হলে যতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে উপন্যাসকে দীর্ঘায়িত করা হোক না কেন, তা রসগ্রাহী পাঠকের চিত্তে কোন সাড়া জাগাতে পারবে না। উপন্যাস বা গল্প বাস্তবসম্মত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা শিল্পসম্মত

হওয়াও দরকার। আর শিল্পসম্মত হলেই সবটুকু পাওয়া গেল এমন কথা বলা যায় না, তা একই কালে মহৎ ভাবোদ্দীপক হওয়া চাই।

এইখানেই অভিজ্ঞতা বনাম প্রজ্ঞার প্রশ্ন এসে পড়ে। মানবজীবন পর্যবেক্ষণ করে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। কিন্তু প্রজ্ঞা আহরণ করতে হলে নিজের এবং পরের মনের গভীরে তলিয়ে যেতে হয়। যিনি যত অধিক পরিমাণে আত্মানুসন্ধানতৎপর তাঁর প্রাজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী সুনিশ্চিত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এইখানে যে, আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক এই সদ্য-কথিত আত্মানুসন্ধান তথা আত্মবিশ্লেষণের দায় পোয়াতে চান না। তাঁদের সবটুকু আশা এবং উদ্যম পর্যবেক্ষণের স্তরেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। এতে একতরফা ফলের অধিক ফল প্রত্যাশা করা যায় না নিপুণ পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বড় জোর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আশা করতে পারি, কিন্তু প্রজ্ঞা বা wisdom ওই সূত্র থেকে কদাচ আসে। তাকে পেতে হলে হাটের কোলাহল থেকে দূরে একক নিভৃতিতে নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে বসা দরকার। এই পাইকারী সৃষ্টির হিড়িক আর ডামাডোলের মধ্যে ওই একাচারী আত্ম-দর্শনের প্রয়োজন সবাই প্রায় ভুলতে বসেছেন। ফলে প্রজ্ঞা অনায়ত্ত থেকে যাচ্ছে, পর্যবেক্ষণক্রিয়াই লেখকজীবনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কথাসাহিত্যিকদের পর্যবেক্ষণ অতি নিখুঁত ও দূরপ্রসারী। তদনুপাতে তাঁদের ভিতর প্রজ্ঞার সঞ্চয় স্বল্প। যাঁর যেটুকু সহজ প্রজ্ঞা আছে তাকেও কাজে খাটাবার উপায় নেই, কারণ প্রায় সকলেই বৈশ্য মনোভাবের যূপকাষ্ঠে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের সম্পদকে বলি দিয়ে বসে আছেন। এই অতি-প্রাচুর্যের লোভ আর প্রতিযোগিতার জরতপ্ত বিক্ষেপের যুগে ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা অতি কঠিন ব্যাপার। শিল্পোৎকর্ষের চাইতে পরিমাণস্ফীতির কদর যেখানে বেশী, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনাদর ঘটতে বাধ্য।

সাহিত্যে আতিশয্য

সাহিত্যের নানারকম শ্রেণীবিভাগ (classification) সম্ভব। কখনও তা ক্ল্যাসিক বা রোমান্টিক, কখনও প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, কখনও আধুনিক বা পুরাতন, আবার একেবারে হাল আমলের পরিভাষা অনুযায়ী কখনও দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী। অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কখনও রূপগত কখনও দৃষ্টিভঙ্গীগত, কখনও কালগত কখনও রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত। শ্রেণীবিভাগের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ভর করে যিনি শ্রেণীবিভাগ করবেন তাঁর রুচি বা প্রবণতার উপর। তিনি যদি শিল্পসচেতন হন তবে ক্ল্যাসিক-রোমান্টিক শ্রেণীবিভাগের দিকেই তাঁর মন স্বভাবতঃ ঝুঁকবে; আর যদি তিনি দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে দেখবার বিশেষ দৃষ্টিকোণ বিচারে উৎসাহী হন, তবে অবধারিত ভাবে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে সাহিত্যকে শ্রেণীবিভক্ত করতে তিনি মূলতঃ উদ্বুদ্ধ হবেন। কিংবা তিনি যদি হন রাজনীতি-সচেতন তা হলে দুয়ে দুয়ে চারের মতই নিশ্চিত বলা যায় যে, তাঁর হাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি 'দক্ষিণ' ও 'বাম' এই রাজনৈতিক সীমাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হবে। অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগের বারো-আনাই নির্ভর করে বিভাগকারীর মর্জির উপর; বাকী চার আনা অংশ মাত্র শ্রেণীবিভাগের নিজস্ব নীতি-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু এ ছাড়াও বিভাগ হতে পারে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তেমন একটি বিভাগের কথাই বলব। বলা বাহুল্য, বর্তমান লেখকের বিশেষ মানস-প্রবণতা এই বিভাজনক্রিয়ায় তাঁকে একান্তভাবে চালিত করেছে। বর্তমান লেখক ভাষার প্রতি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মনোযোগপরায়ণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাষা বিচারে তাঁর উৎসাহ। ভাষার মধ্যেই তিনি প্রথমে সাহিত্য-রচয়িতার মনোজীবনের সন্ধান করেন—অন্য সব বিচার আসে পরে। মনো-জীবনের এবং মনোগঠনের। যে কোন রচয়িতার ভাষা বিচার করে বলে

দেওয়া যায় তিনি কী পরিমাণ ও কতটা যুক্তিবাদী, কিংবা কতটা পরিমাণ ভাবালুতামণ্ডিত। কথায় বলে style is the man। কিন্তু এখানে স্টাইলের কথা বলা হচ্ছে না, বিশুদ্ধ ভাষার কথাই বলা হচ্ছে। স্টাইল বলতে ভাষারীতি, আঙ্গিক, প্রকাশপদ্ধতি, মনন ইত্যাদি নানা বস্তুর সমবায় বোঝায়। ভাষা শুধুমাত্র ভাষা। উপরে যে ক্ল্যাসিক-রোমান্টিক বিভাগের কথা বলেছি তা ওই স্টাইলের বিচার থেকে আসে। যে রচনায় প্রকাশের সৌকর্য ও সৌন্দর্যকে সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়, ভাষারীতিকে গাঢ়বদ্ধ, সংহত, অর্থান্বিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়, ভাবের প্রাচুর্য ও আকৃতিকে আঙ্গিকের সংযমের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ামিত করা হয়, এক কথায় 'ফর্ম'কেই যে রচনার মূল উপজীব্য করা হয়, তাকে ক্ল্যাসিক রচনারীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অন্যপক্ষে, যে রচনারীতিতে বক্তব্যের প্রাচুর্য, ঐকান্তিকতা ও আবেগসমৃদ্ধিকে বাধাবন্ধহীনভাবে প্রকাশের দ্বারাই তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার আদর্শ স্বীকৃত, ফর্মের অনুশাসন না মেনে ভাবোচ্ছ্বাসকে যেখানে লেখনীমুখে স্বতঃই আলগা দেওয়া হয়, যে রচনারীতির অন্তর্নিহিত মনোভাবের ভিতর স্বপ্নকামনাটাই প্রধান এবং বাস্তবচেতনা তদনুপাতে অনুপস্থিত, তাকে আমরা 'রোমান্টিক' রীতি আখ্যা দিতে পারি।

কিন্তু এসবই হচ্ছে জটিল মানদণ্ডের বিচার। অনেকগুলি বিচার এখানে একসঙ্গে গ্রথিত। বিশুদ্ধ ভাষার বিচার তা থেকে স্বতন্ত্র জিনিস। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভাষাটাই মুখ্য বিচার্য ; সাহিত্যে কে কোন্ মনোভাবের পরিপোষক—কে 'ফর্ম'বাদী আর কে 'ফর্ম'বাদী নন, কে প্রগতিপন্থী আর কে প্রগতিপন্থী নন—এ সব প্রশ্ন সেখানে উত্থাপিত হবার অবকাশ অল্প। এই বিশেষ মানদণ্ডে আমরা বাংলা সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, কাব্যগন্ধী বাংলা সাহিত্য ; দুই, যুক্তিনিষ্ঠ বাংলা সাহিত্য। 'কাব্যগন্ধী' আর 'যুক্তিনিষ্ঠ' কথা দুটি কী অর্থে প্রযুক্ত হল তা একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

'কাব্যগন্ধী' বলতে এখানে কবিতা বা কাব্যের সংস্কারের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করা হচ্ছে না। সেই শ্রেণীর রচনাকেই কাব্যগন্ধিতার বেড়ের মধ্যে

আনা হচ্ছে, যা গদ্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও ভাবালুতা আর গদগদভাষের সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। কাব্যের স্বক্ষেত্রে কাব্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ, এবং এ কথা কে না জানে যে কবিতা বাদ দিলে সাহিত্যের একটা মুখ্য এবং ব্যাপক অংশই বাদ পড়ে যায়। বিশুদ্ধ ভাবের জগতে কাব্যের অধিষ্ঠান এবং সৌন্দর্য পরিবেশনই তার লক্ষ্য। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনের ও স্বভাবের উন্নয়ন ও প্রকর্ষসাধনে সাহিত্যজগতে কাব্যের তুল্য আর বস্তু নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, কাব্যেতর ক্ষেত্রেও আমরা কাব্যভাব আমদানি করব কি না এবং করলেও তা কতটা পরিমাণ করব। যে রচনায় যুক্তিটাই আদত কথা, এবং যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বক্তব্য না সাজালে যে রচনার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সেই রচনাকে কাব্যগন্ধী ভাষা ও ভাবের দ্বারা জবজবে করে তোলার কী সার্থকতা থাকতে পারে? অথচ বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা মোটা অংশের ভিতর এই কাব্যিক সংস্কারটাই বলবৎ দেখতে পাই। অধিকাংশ লেখক এমনভাবে ভাষার ব্যবহার করেন যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, গদ্যের যে একটা নিজস্ব জগৎ আছে—যুক্তি-বুদ্ধি ও মননশীলতার জগৎ—সে জগতের পদ্ধতি-প্রকরণের সহিত এই সব লেখক সম্যক্ পরিচিত নন; তাঁরা যেন কাব্যের পরিমণ্ডল থেকে সটান গদ্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, এখনও তাঁদের গা থেকে অবগাহন-স্নানাবশেষ কাব্যের জল ঝরছে। এ রকম কেন হবে তা সঠিক বোঝা যায় না। আমরা এমন কথা বলি না, যে-সব রচনা ভাবপ্রধান এবং মৌলিক সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই সব সৃষ্টিধর্মী গদ্যরচনায় কাব্যভাবের স্থান নেই। স্থান আছে এবং একটু বেশী পরিমাণেই আছে। রোমান্টিক রীতির দ্বারা কর্ষিত কথাসাহিত্যের বা ভাবুকতামণ্ডিত রম্যরচনার বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'র প্রয়োজন হয়তো কখনই ফুরোবে না। কিন্তু যেটি গদ্যের নিজস্ব ক্ষেত্র, যেখানে সমগ্র বক্তব্যকে আদ্যন্তমধ্য একটা যুক্তির শৃঙ্খলার দ্বারা সংযত ও বিন্যস্ত করবার প্রয়োজন আছে, সেখানেও কেন যে বারে বারেই কাব্যভাবের দ্বারস্থ হতে হবে তা বুঝতে পারা যায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এটি যে একটি মজ্জাগত ত্রুটি তা স্বীকার করতেই হয়।

বাংলা সাহিত্যের ধারাধরন, সাহিত্যিকদের ভাষার ভঙ্গিমা ও গঠন পর্যালোচনা আর বিশ্লেষণ করে আমার এই সুনিশ্চিত ধারণা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে সেই জাতের লেখকই বেশী যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবহাওয়াতেই প্রধানতঃ বেড়ে উঠেছেন; মননশীলতার প্রতি স্বভাবগত পক্ষপাতবিশিষ্ট লেখকের সংখ্যা অঙ্গুল্যগ্রগণনীয় বললেও চলে। অর্থাৎ অধিকাংশ লেখকই বুদ্ধিজগতের কোন ধার ধারেন না; চিন্তা-আন্দোলনের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখেন না; দেশে দেশে যে সকল নূতন নূতন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শের অভ্যুদয় হচ্ছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে তো পরের কথা সূত্রাকারেও অনুশীলন করবার প্রয়োজন বোধ করেন না; দর্শনকে সাহিত্যজগতে অপাংক্তেয় জ্ঞান করেন এবং তা থেকে সহস্রহস্ত দূরে থাকবার চেষ্টা করেন ইত্যাদি। এই নঞর্থক তালিকার উপর সামান্য চোখ বুলোলেই বোঝা যাবে, শুদ্ধমাত্র নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসম্পর্কিত রচনা অর্থাৎ গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি সংরচন আর পাঠ করেই তাঁরা সাহিত্যানুশীলনের দায়িত্ব সমাপন করেন। ঝুড়ি-ঝুড়ি গল্পোপন্যাস পড়ে ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করে ভাবেন, সাহিত্যের শিক্ষা যথেষ্ট পাওয়া হয়ে গিয়েছে, মনকে সমৃদ্ধ ও সুমার্জিত করে তুলতে আর অন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। সাহিত্যের শিক্ষা বলতে যে রস-রসিকতা আর মননশীলতা এই দ্বিবিধ বস্তুরই শিক্ষা বোঝায় এই বোধ অনেকেরই নেই। সত্যকার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী—এর ভিতর রসিকতার যেমন স্থান আছে তেমনি চিন্তারও স্থান আছে। শুদ্ধমাত্র রস-রসিকতার চর্চা করলে মনের একটা বড় দাবি হয়তো পূরণ হয়, কিন্তু অন্য আর একটি বড় দাবি অপরিপূরিত থাকে। সাহিত্যে আমরা এতাবৎ delight-এর আদর্শকে বড় বেশী প্রাধান্য দিয়ে এসেছি, এতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর এমন একটা একচক্ষু সঙ্কীর্ণতা এসেছে, যা শুধু মনন ও বুদ্ধির সচেতন প্রয়োগের দ্বারাই শোধিত, এমন কি নিরাকৃত হওয়া সম্ভব। আনন্দ বা লীলা সাহিত্যের মূল উপজীব্য হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সমাজকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়, বিদ্যাবত্তা আর জ্ঞানগর্ভতার সংস্কারের

দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ততক্ষণ তা নিতান্ত একপেশে হয়েই থাকে। এ কথা অপ্রিয় হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের সাহিত্যিকদের ভিতর জ্ঞানের সংস্কার বড় দুর্বল, চিন্তার দীপ্তি খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁদের রচনাদেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য তো বটেই, অন্যান্য বর্গের সাহিত্যিক—গদ্য-সাহিত্যিকদের বেলায়ও এ কথা প্রায় সর্বাংশে খাটে। তথাকথিত রোমান্টিক মেজাজের দ্বারা, চিন্তাবিমুখ 'কাব্যি-কাব্যি' ভাবের দ্বারা আমাদের গদ্যসাহিত্য আগাগোড়া আবিষ্ট।

অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। যাঁরা যুগপৎ সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের চর্চা করেন, তাঁদের রচনার ভিতর তবু বরং এক ধরনের বুদ্ধির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের আঁটসাঁট, সংহত ভাষাভঙ্গী এবং বহির্মুখীনতা এবং 'আইডিয়া'-জীবিতা তাঁদের বুদ্ধিগত সক্রিয়তার পরিচয় দেয়। ঠিক 'মননশীলতা' হয়তো একে বলা যায় না, তবে মেজাজটুকু যেন মননশীলতারই মেজাজ। সাংবাদিক-লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আর যত অভিযোগই থাকুক, এই দিক দিয়ে অন্ততঃ সৃষ্টিধর্মী লেখকদের উপর তাঁদের জিৎ যে, তাঁরা চিন্তারাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নন; আইডিয়া তাঁদের চোখে taboo নয়; দার্শনিকতার আবহাওয়ায় তাঁদের ডাঙায়-তোলা মাছের মত খাবি খাওয়ার অবস্থা হয় না; রাজনীতি অর্থনীতি তো বটেই, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ভাবের পরিমণ্ডলে তাঁরা সহজেই নিঃশ্বাস নিতে পারেন, গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণামাত্রে অস্বস্তিকবলিত হয়ে তাঁরা হাস্যকরতার নজির সৃষ্টি করেন না। আমাদের তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী লেখকদের ধারাধরন দেখে বিশেষভাবে এবং গদ্যলেখকদের ভাষাভঙ্গী লক্ষ্য করে সাধারণভাবে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, লেখকেরা দৃশ্যতঃ সংস্কৃতির কারবারী হলেও তাঁদের সঙ্গেই সংস্কৃতির সম্পর্ক সবচেয়ে কম। সংস্কৃতি বলতে যে নানামুখী বিষয়ের কৌতূহল ও অভীপ্সা বোঝায়, সেই বিচিত্র পথগামী জিজ্ঞাসার ছাপ আমাদের লেখকদের মধ্যে আদপেই নেই।

সবাই প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে কাব্যিকতার চর্চা নিয়ে আছেন—কি কাব্যে কি গদ্যে।

এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লেখকের ভাষাভঙ্গীর গঠন, সে কথা আগেই বলেছি। বছর তিনেক আগে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী 'স্টেটসম্যান'-এর পাতায় বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বাংলা ভাষাভঙ্গীর দু'একটি নজির উপস্থাপিত করে যে অভিযোগ করেছিলেন, সে অভিযোগ এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'When the war broke out' বাক্যাংশের অনুবাদে খুব কম বাঙালী লেখকই 'যুদ্ধ যখন বাধল' এই নিরাভরণ সাদামাঠা অথচ একান্ত স্বাভাবিক বাক্যাংশ ব্যবহার করবেন; বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক কাব্যিকতার সংস্কার অনুযায়ী অধিকাংশেরই অবধারিত প্রবণতা যাবে এ-জাতীয় কোন-না-কোন এক অনুবাদের প্রতি —'যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠল,' 'যুদ্ধের ঘনঘটায় আকাশ যখন সমাচ্ছন্ন হল,' 'নৃমুণ্ডমালিনী, করালরূপিণী কালী যখন রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দেখা দিলেন,' 'লড়াইয়ের কাড়ানাকাড়ায় যখন সবে শক্ত হাতের বেদম ঘা পড়ল,' 'হামলা বা খেল যখন শুরু হল' ইত্যাদি ও প্রভৃতি। ঠিক এই ভাষাভঙ্গীই যে হুবহু প্রযুক্ত হবে তা নয়, তবে ভঙ্গিমাটা হবে অনেকটা এই রকমেরই। অর্থাৎ সবটাই তেড়া-বাঁকা, দুমড়ানো-মুচড়ানো, ঘোরালো-প্যাঁচালো, সামান্য একটা কথাও সহজ করে বলবার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের মজ্জাগত কাব্য-পক্ষপাত থেকেই যে ভাষার ক্ষেত্রে এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই বলা যায়।

অনুবাদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হল সে কথা মৌলিক রচনা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য, বলাই বাহুল্য। অনুবাদের ভাষা কিছু শূন্য থেকে আবির্ভূত হয় না, ওটি মৌলিক রচনাভঙ্গী থেকে জাত এবং পদে পদে তাকেই অনুসরণ করে। উপরে যে কটি নমুনা উদ্ধৃত হল তার সব কটিই উপমার দৃষ্টান্ত—হয় simile নয় metaphor—কিন্তু এ বাদেও নানাবিধ শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে বাংলা গদ্যদেহ ভারাক্রান্ত ও তার চলার গতি আড়ষ্ট। বাংলা

গদ্যের চলন অনেকটা মেদবহুলা গহনাভারাক্রান্তা গজেন্দ্রগামিনী নায়িকার চলনের মত—মন্থর, আলস্যশিথিল, স্ফূর্তিহীন। অতিরিক্ত ভূষণ, মণ্ডন আর প্রসাধনপ্রিয়া নারীর মত তারও উপর বিরাশি-সিক্কা ওজনের গহনার ভার ও সজ্জার বাহুল্য। এই ভার ও বাহুল্য নির্মম হস্তে খর্ব না করা পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের মুক্তি নেই, সে কথা জোরের সঙ্গেই বলব।

ওই দেখুন, অজ্ঞাতসারে আমার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও কাব্যিকতার আমেজ লেগে গেল। কোথাও কিছু না, উপমা উড়ে এসে জুড়ে বসল। বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক ঐতিহ্য এত প্রবল যে অতিবড় গদ্যপ্রাণ লেখকেরও তার কবল থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, ওই পরিস্থিতির কবল থেকে মুক্তি আমাদের অর্জন করতেই হবে, মুক্তি আমরা অর্জন করব।

আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকের সমস্যা

আধুনিক সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে সমাজভাবনার যোগ অতি নিগূঢ়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রবহমাণ আদর্শ সমাজবাদ সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে যে এ দুটি ধারণাকে বিচ্ছিন্নভাবে, পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে বিচার করা আজকের দিনে সত্যই কঠিন। কোথায় সমাজভাবনার শেষ, সাহিত্যচিন্তার আরম্ভ, কিংবা সাহিত্যচিন্তা কোন্ সীমানায় এসে সমাজভাবনার এলাকায় প্রবেশ করেছে তার হদিস পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। বরং তার চেয়ে সমাজ ও সাহিত্যচিন্তাকে সম্পৃক্ত করে দেখলেই যেন এ যুগের বিশেষ দেখার দাবী পরিপূরিত হয়।

সমাজভাবনার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যশিল্পের এই-যে নিকট সম্পর্ক, এটি এখনকার কালের পটভূমিকায় যেমন নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার তেমনি কতকাংশে দুরূহতারও সৃষ্টি করেছে। বিশেষ, সাহিত্য-সমালোচকের নিকট এই দুরূহতা অতি প্রত্যক্ষ। ভাবাদর্শের বিচারে যে যোগাযোগ এখনকার কালের পাঠকের পক্ষে নিরতিশয় স্বাভাবিক বলে মনে হবে, আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকের নিকট তা-ই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক সাহিত্য-সমালোচক ঠিক ভেবে পান না তিনি তাঁর সাহিত্য-মূল্যায়নের কাজে সমাজ-ভাবনাকেই সমধিক প্রাধান্য দেবেন, না, বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শকেই বিশেষ ভাবে অনুসরণ করবেন। সত্যকার বিবেকবান আধুনিক সমালোচক প্রায়শ এ-জাতীয় দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার সম্মুখীন হন এবং সেই সূত্রে তাঁকে কঠিন আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। যাকে আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধি বলি, এ যুগের সমালোচকের নিকট তার মূল্য থাকলেও তাকে তিনি পূরাপূরি মূল্য দেন না। কারণ তা-ই যদি সাহিত্য-বিচারের চূড়ান্ত এবং একমাত্র মানদণ্ড হবে, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যে প্রগতির কোন অর্থ হয় না। সেই পুরাতন-প্রচলিত গতানুগতিক সাহিত্যাদর্শকে এ যুগেও যদি সমান মূল্য দিতে হয়, তবে আর

যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সাহিত্যবুদ্ধির কতটুকু বিবর্তন হল? সকল রকম বুদ্ধির মত সাহিত্যবুদ্ধিরও বিবর্তন আছে, এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা ও অবস্থার পরিবর্তন এই বিবর্তনের মূলে অনেকখানি পরিমাণে সক্রিয়, সে কথাও স্বীকার করতে হয়। সুতরাং নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের আদর্শ নিয়ে যে এ-যুগের সমালোচক তৃপ্ত থাকতে পারেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পক্ষান্তরে, সমালোচকের অন্যবিধ অসুবিধাও আছে। তিনি যখন সাম্প্রতিক রচনার ভিতর রচয়িতার সমাজচেতনার প্রমাণ পেয়ে উল্লসিত হন, সেই উল্লাসের দ্বারা তাঁর বিপথে চালিত হবার আশঙ্কা থাকে। বস্তুতঃ তিনি মাঝে মাঝে বিপথে চালিত হনও। ফলে সাহিত্যের আঙিনার ভিতর ভুলবিচারের জঞ্জাল জমে উঠে সাহিত্যের আবহাওয়াকে সহজেই আবিল করে তোলে। কারণ এ কথা আধুনিক সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে নিয়ত স্মরণ রাখা দরকার, যাকে আমরা সমাজচেতনা বলি, 'সমাজ-বাস্তবতা' (Social Realism) বলি, সেইটে সমকালীন সাহিত্যবিচারের অন্যতম মাপকাঠি হলেও সেইটেই একমাত্র মাপকাঠি নয়। সেই পুরাতন কথাতেই ফিরে আসতে হয়। সাহিত্যের সমাজভাবনা-নিরপেক্ষ আলাদা একটা রূপ আছে। এ রূপ সাহিত্যের রসরূপ, সৌন্দর্যের রূপ। এই রূপটিই সাহিত্যের আদি এবং মূল রূপ, সমাজ-বাস্তবতা স্বতঃই তার অনুগত ও অধীন। সৌন্দর্য বা রস যদি সাহিত্যের প্রাণ হয় তা হলে সমাজচিন্তা তার দেহ; একটি চিন্ময় সত্তা, অপরটি মৃন্ময় বহিরাবরণ মাত্র। সাহিত্যের এই-যে রসরূপ, একে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে অনেকগুলি প্রকরণের আশ্রয় নিতে হয়—শব্দচেতনা, বাগ্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, প্রকাশের মার্জিত রীতি, আঙ্গিকনৈপুণ্য, সর্বোপরি লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গী। অর্থাৎ এক কথায় লেখকের একটা নিজস্ব স্টাইল থাকা চাই। স্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই ভিন্ন নাম মাত্র। যে লেখকের স্টাইল নেই সে লেখকের সাহিত্যজগতে অন্ততঃ কোন ব্যক্তিত্ব নেই। বর্তমানকালীন লেখক সমাজ-

ভাবনার দ্বারা তাঁর রচনাকে যতই সমৃদ্ধ করুন-না কেন, তাঁর লেখায় যদি স্টাইল না থাকে, অতিমাত্র উদার বিচারেও তাঁর লেখা গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ সমাজ-বাস্তবতা আধুনিক সাহিত্যের একটি অপরিহার্য উপকরণ হলেও শুধুমাত্র ওই গুণে কোন লেখাই সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। সমাজ-বাস্তবতা সাহিত্যের মূল বুনিয়াদ নয়, মূল বুনিয়াদ রস বা শিল্পসৌন্দর্য।

এইখানেই ঘটে যত বিপত্তি। যুগধর্মের অজুহাতে, প্রগতিশীলতার দোহাই পেড়ে আধুনিক সাহিত্যের অনেক লেখক সমালোচকের দরবারে কৌলীন্যলাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। সত্যসন্ধ সমালোচককে এসকল ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সমালোচকের ভিতর যে সামাজিক সত্তা আছে, সমাজের বহুবিধ অন্যায়-অবিচারের দৃষ্টান্তে মর্মাহত যে সম্যক্‌দর্শী বিবেকী চেতনা আছে, সেই সত্তা ও চেতনা লেখকের সমাজবুদ্ধির প্রমাণদৃষ্টে উৎসাহিত হয়, কিন্তু ওই উৎসাহ তাঁকে খুব বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সমালোচক যখনই দেখেন যে লেখক সমাজভাবনাযুক্ত হলেও যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পবোধযুক্ত নন, ভাবপ্রকাশের বিশেষ রীতিনীতি ও কলাকৌশলগুলি তাঁর তেমন আয়ত্তে নেই, সমালোচকের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। সমালোচক প্রগতিশীল মতাদর্শে বিশ্বাসী তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু শুদ্ধমাত্র ওই প্রগতিশীলতাই তাঁকে সমালোচকের ভূমিকায় আসীন করে নি, তাঁর সহজাত রসবোধই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচারকের গৌরবের অধিকার দিয়েছে এবং কবচকুণ্ডলের মত তাঁর সেই অধিকার রক্ষা করছে। আধুনিক সাহিত্য-সমালোচক সহজাত রসবোধের অধিকারী হয়েও যে সমাজবাদী চিন্তাধারার অনুরাগী সেটি তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য; এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর প্রযত্নের অভাব নেই। তাই বলে সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গে তিনি প্রগতিচেতনাকে রসবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দিতে আদৌ রাজী নন। আধুনিক সাহিত্যরচনা প্রগতিশীলতার লক্ষণমণ্ডিত হলে খুবই ভাল কথা, না হলে ক্ষতি নেই এমন বলব না, তবে সে বোধ হয় খুব বড় দরের ক্ষতি নয়। সাহিত্যরচনার ভিতর রচয়িতার স্টাইলের অভ্রান্ত পরিচয় যদি

থাকে, লেখকের বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছাঁচটি লেখার ভিতর দিয়ে যদি প্রকাশ পায়, সমালোচকের পক্ষে সে লেখা অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।

তাই বলে বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্যের অজুহাতে এ যুগের পটভূমিতে বাস করেও যে সকল লেখক প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রতি উদাসীন কিংবা বিমুখ হয়ে থাকেন, তাঁদের মনোভাবও সমর্থন করা যায় না। হতে পারে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতিশয় লিপিকুশল রচয়িতা, সহজাত সাহিত্যবুদ্ধি নিয়ে স্বাভাবিক দাবীতে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্টাইল বা ব্যক্তিত্বের ছাপ এঁদের রচনায় অপ্রতিরোধ্যরূপে বর্তমান থাকা সম্ভব। সত্যসন্ধ সমালোচক প্রগতিবাদী হওয়া সত্ত্বে এঁদের রচনার আকর্ষণ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারেন না, যেহেতু তাঁর সত্যানুরাগই এক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিকূল আচরণ থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সমালোচক এ কথাও না মেনে পারেন না যে, যে-পরিমাণে এঁদের রচনায় আধুনিক কালোচিত ধ্যানধারণার চেতনা অনুপস্থিত, ঠিক ততটাই তাঁদের রচনা খণ্ডিত ও অসার্থক। আধুনিক সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডে প্রগতিশীল ভাবাদর্শের প্রতি তাঁদের এই মজ্জাগত অনীহা তাঁদের রচনার অপূর্ণতার একটি প্রমাণ, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধি থাকা ভাল, বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধির অভিমান থাকা ভাল নয়। আর সেই অভিমানের বশে প্রগতিশীল ভাবাদর্শগুলির প্রতি পিঠ দিয়ে থাকা তো আরও বড় রকমের বিচ্যুতি। আধুনিক সাহিত্য-সমালোচক কোনমতেই এই বিচ্যুতিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন না।

আমাদের তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যবাদীদের মধ্যে এক ধরনের আহ্লাদেপনা আছে। তাঁরা প্রগতিশীল যুগচেতনার প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসকে তাঁদের কৌলীন্যের প্রমাণ বলে মনে করেন। আভিজাত্যের অভিমানে তাঁরা ডগমগ। তাঁদের এই অভিমান কিঞ্চিৎ প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মন্দ হয় না যে, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর যুগ-অচেতন। যে-যুগের সীমানার ভিতর তাঁরা বাস করছেন সেই বিশেষ কালের মনন, চিন্তা, প্রশ্ন-সমস্যা সম্পর্কে অচেতন থাকাটা

গুণ নয়, ত্রুটি। লেখকের বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির দ্বারা এই ত্রুটির শোধন হয় না। আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির আদর্শকে সর্বপ্রথমে স্থান দিলেও সমকালীন লেখকদের কাছ থেকে যুগচেতনা সর্বদাই প্রত্যাশা করি। সমাজ-বাস্তবতায় আমরা দোষ দেখি না, বরং তাকে রচনার অভিনন্দনযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। রচনার ভিতর সমাজ-বাস্তবতার চিহ্ন পরিস্ফুট না হলে আধুনিক সমালোচকের প্রত্যাশা বিশেষ ভাবেই অতৃপ্ত থেকে যায়। যে সকল লেখক নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধির পেরেকে তাঁদের সবটুকু উদ্যম আর সময় ঝুলিয়ে বসে আছেন তাঁরা যত বড় ক্ষমতাবান লেখকই হোন, আধুনিক সমালোচকের কাছ থেকে পুরাপুরি স্বীকৃতি আশা করতে পারেন না।

আধুনিক সমালোচকের নিকট আর-একটি সমস্যা হল গ্রামীণ বিষয়বস্তু আর নাগরিক বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক উৎকর্ষ বিচারের সমস্যা। ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশ যেহেতু মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক দেশ, সেইহেতু গ্রামীণতা তার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বভাবতঃই একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। সেই তুলনায় নাগরিকতার প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনের উপর অত্যন্ত কম, সুতরাং সাহিত্যের উপরও অতিশয় অল্প বলা চলে। এখন পর্যন্ত নাগরিক ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যের এলাকাকে তেমন করে স্পর্শ করতে পারে নি। তার মানে এ নয় যে, গ্রামীণ চিত্রচরিত্রই চিরকাল আমাদের সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য বিষয় হয়ে থাকবে, সাহিত্যে নাগরিকতার প্রভাবপরিধি বিস্তৃত হতে পারবে না। আমাদের অধিকাংশ পাঠকেরই মনন ও ভাবনা গ্রামীণতার সুরে বাঁধা, নাগরিক ভাব এখনও বাংলা দেশের পাঠকের ভাল রপ্ত হয় নি। এটি আমাদের পাঠকসমাজের মানসিক অনগ্রসরতার একটি প্রমাণ। অথচ ভুল করে এটিকেই আমাদের পাঠকসম্প্রদায়ের সহজ রসবুদ্ধির পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া হয়, আর এই ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রাবল্যের জন্যই বাংলা সাহিত্যে পল্লীকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর জয়জয়কার। কেমন করে জানি না এই কিম্ভূত ধারণা আমাদের অধিকাংশের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, পল্লীকেন্দ্রিক বিষয়ের চিত্রণই হল আমাদের সাহিত্যিকদের পক্ষে একমাত্র

স্বাভাবিক ও গ্রাহ্য কাজ; নগরজীবনের রূপায়ণের মধ্যে যথেষ্ট রসবুদ্ধির দ্যোতনা নেই। বাংলা সাহিত্যের যে সকল লেখক নগরজীবনের পটভূমি অবলম্বন করে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের সবারই লেখা আমরা কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকি; ভাবখানা এই যে, নগর-জীবন যেহেতু নানাবিধ কৃত্রিমতামণ্ডিত সে-কারণ নগরজীবনের চিত্রণমাত্রই কৃত্রিমতার লক্ষণমণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু এরূপ ঢালাও সিদ্ধান্তীকরণের যুক্তিসঙ্গত কোন ভিত্তি নেই। লেখক পল্লীকেন্দ্রিক নগরকেন্দ্রিক যে বিষয় নিয়েই লিখুন, তাঁর শক্তিমত্তার দ্বারা তাঁর রচনার গুণাগুণ নিরূপণ করতে হবে, এ-ক্ষেত্রে মূল্যবিচারে অন্য কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করা চলে না। নগরজীবনের জটিলতা আমাদের পছন্দ না হতে পারে—না হবারই কথা—কিন্তু যে-লেখক নগরবদ্ধ এই জটিলতাকে সার্থকভাবে তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাঁর রচনার শিল্পোৎকর্ষ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত সনাতন গ্রামীণতার দ্বারা নাগরিকতাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা নিরর্থক।

মূল্যবিচারের এই-যে সমস্যা, এ সমস্যার সমাধানপ্রয়াসের বেলায় সমালোচকের বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কথাসাহিত্যে গ্রামীণ বিষয়ের প্রতিফলনমাত্রেই তিনি যেন উল্লসিত না হয়ে ওঠেন। যে লেখকের একমাত্র পুঁজি গ্রামীণতা এবং পাঠকসাধারণের অনগ্রসরতা এবং সেই সূত্রেই তাঁর যা-কিছু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, সেই লেখকের রচনাবলীকে প্রগতিশীল মনে করবার কোনই কারণ নেই। পাঠক এ-জাতীয় ভুল হামেশাই করে থাকেন, কিন্তু সমালোচক যেন এ ভুল না করেন। বিচারপ্রবণ সমালোচককে এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, পাঠকের অনুন্নত অবস্থার স্তরে নেমে এসে পাঠকের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারার মধ্যে লেখকজীবনের কোন গৌরব নেই। রচনার মাধ্যমে পাঠকের মানসিক স্তর উন্নীত করতে পারাটাই হচ্ছে সত্যকার প্রগতিশীলতা। নগরসাহিত্যের মধ্য দিয়ে যদি এই উদ্দেশ্য সর্বাধিক সিদ্ধ হয় তা হলে গ্রামীণ বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও বলব, নগরসাহিত্যই হচ্ছে এ যুগের লেখকের পক্ষে সবচেয়ে বেশী অনুশীলন-

যোগ্য। আর যাই হোক, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হবার নামে, আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলবার নামে লেখকগণ যেন তাঁদের রচনায় সাধারণ মানুষের মানসিক অনগ্রসরতার স্তরে নেমে না আসেন। সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে এর চেয়ে আত্মঘাতী ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

এ যুগের প্রবহমাণ শ্রেষ্ঠ ভাবাদর্শগুলির একটা বড় প্রয়োগের ক্ষেত্র হল শহর। সুতরাং শহরকে সমসাময়িক সাহিত্যের পরিধির ভিতর তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে বইকি। সমাজবাদ বলুন সাম্যবাদ বলুন সর্বশ্রেণীর নিপীড়িত মানুষের উদ্ধারসাধনের আদর্শ বলুন, শহরকে বাদ দিয়ে এ সকল আদর্শ কার্যকরী করা কঠিন—কি জীবনে কি সাহিত্যে। কাজেকাজেই শহর সমকালীন সাহিত্যের পরিকল্পনার ভিতর ন্যায়সঙ্গতভাবেই একটা বড় জায়গা দাবী করতে পারে। এ কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে যে, সাহিত্যবিচারের এলাকায় গ্রামীণতামাত্রই অভিনন্দনযোগ্য নয়। গ্রামীণতার ভিতর স্বতঃই স্বাভাবিকতা তথা আন্তরিকতা লুকিয়ে আছে এমন মনে করবার হেতু নেই। গ্রামীণতায় আমাদের মন চিরাভ্যস্ত বলে এবং এ দেশে নাগরিক মানসিকতার এখনও ভাল করে বিকাশ হয় নি বলে আমরা গ্রামকেই সাহিত্যের একমাত্র বিষয় ভাবতে স্বভাবের স্ফূর্তি অনুভব করে থাকি। এ স্ফূর্তি কিঞ্চিৎ প্রতিরুদ্ধ হলে সাহিত্যের ভাল বই মন্দ হবে না।

সমালোচকের এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দায়িত্ব আছে। তিনি আসল-মেকী চিনিয়ে দিতে পাঠককে সাহায্য করবেন। গ্রামীণ রচনার মূল্যায়নের বেলায় তিনি পাঠককে সচেতন হবার পরামর্শ দেবেন। সত্যকার ক্ষমতাযুক্ত গ্রামজীবনের চিত্রকে তিনি অবশ্যতঃই শিল্পকৌলীন্যের শিরোপা দেবেন, অন্য দিকে যে সকল লেখক বিদগ্ধ নাগরিক লেখক বলেই বিশেষভাবে বাংলার পাঠকসাধারণ্যে অসুবিধাগ্রস্ত হয়ে আছেন তাঁদের যথাপ্রাপ্য মর্যাদা যাতে তাঁরা পান তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। বিদগ্ধ লেখকের দগ্ধ ভাগ্যের উপর তিনি স্বীকৃতির প্রলেপ দেবেন। 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী' কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি' নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ কয়েকটি দান, কিন্তু এ সকল উপন্যাসের আদর্শে লিখিত বইমাত্রই শ্রদ্ধেয় নয়। গ্রামের পচা ডোবা আর এঁদো গলি আর ঘেঁটু ফুল আর মা-শেতলার থানের অন্তহীন বর্ণনায় এ যুগের রুচিবান পাঠকের শুধু বিরক্তিরই উদ্রেক করে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা আমাদের দীর্ঘ-পরিচিত হলেও গ্রামীণতায় আমরা ফিরে যেতে চাই না।

আধুনিক সমালোচকের নিকট সেই লেখকই আদর্শ লেখক, যিনি স্বীয় রচনার ভিতর রসবুদ্ধি ও প্রগতিবুদ্ধি সমন্বিত করতে পেরেছেন। প্রাচীন এবং অর্বাচীন, ঐতিহ্যবোধ ও যুগচেতনা, গ্রামীণতা ও নাগরিকতা, লিপিনৈপুণ্য ও বিষয়বস্তুর মহিমা, রূপ ও ভাব এক আধারে বিধৃত হলে তবেই বুঝি আদর্শ লেখকের যোগ্যতা লাভ করা যায়। আমাদের একালীন কথাকারদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়ভাবে এই যুগ্ম আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন তাঁদের ভিতর রয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, দীপক চৌধুরী প্রভৃতি। এঁদের পরস্পরের ভিতর মনোভঙ্গীর বিস্তর পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এঁরা যে প্রত্যেকে নিজের কালের বিশেষ ধাঁচ ও ধরনটি সম্পর্কে সচেতন এবং নিজ-নিজ ভাবে স্বীয় রচনার ভিতর এ যুগের মেজাজটিকে ধরবার চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জীবিত ও মৃত কবিকুলের ভিতর আমরা এঁদের নাম করতে পারি, অবশ্য রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের কথাই বলছি—মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস প্রভৃতি। এঁদেরও পরস্পরের মধ্যে মানস-গঠনের তফাত বিস্তর, তবে ভাবকল্পনার বৈশিষ্ট্যে ও আঙ্গিকের প্রয়োগে এঁদের সকলকে এ কালেরই বিশেষ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলে মনে করা যায়। যে সকল কথাকার ও কবির নাম করা হল তাঁদের প্রত্যেকেই সাহিত্যবিচারের প্রথম মানদণ্ড সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ এঁদের প্রত্যেকেরই রচনায়

একটা নিজস্ব স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ এঁদের রচনার উপর সুপরিস্ফুট। নিজ-নিজ পথে সাহিত্যসিদ্ধির আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত—লিপিনৈপুণ্যের শর্ত, সৌন্দর্যবুদ্ধির শর্ত—পরিপূরণে সমর্থ হয়েছেন বলেই সমালোচকের বিচারে এঁরা জাত-লেখকের ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন। তদুপরিও যে সমালোচক এঁদের রচনাপাঠে বাড়তি উৎসাহ বোধ করেন সে এঁদের রচনায় যুগচেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করে। এঁদের সকলে এ যুগের সবচেয়ে সক্রিয় আদর্শ সমাজবাদের অনুগত না হতে পারেন, বামপন্থী চিন্তাধারার পরিপোষকও হয়তো সকলে নন, তবে এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে প্রবহমাণ কালের বিশেষ রঙ ও রস, ধাঁচ ও ধরন অল্পবিস্তর এঁদের সকলেই তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কি আঙ্গিকের প্রয়োগে কি রূপকল্পের ব্যবহারে এঁদের সকলেরই রচনা এ কালের মানসিকতার প্রতীক। এ যুগের বিশেষ স্বাদ-গন্ধ আমরা এঁদের রচনায় যেমন ভাবে পাই বিশুদ্ধসাহিত্যবাদীদের রচনারীতির ভিতর তার সিকির সিকিও পাই না। প্রত্যেক কালেরই একটা বিশেষ atmosphere বা পরিবেশ থাকে। পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে কালিদাসের কাব্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্যই বাদ পড়ে যায়। জাত-লেখক-মাত্রই তাঁর সমসাময়িক কালের এই পরিবেশটিকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শুধু তথাকথিত বিশুদ্ধবাদীরাই এ সম্বন্ধে অচেতন থাকেন। আধুনিক সমালোচককে সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে ঐতিহ্যচেতনা ও যুগচেতনা এই দুইয়েরই হিসাব নিতে হয়। এই দুইয়ের ভিতর ঐতিহ্যচেতনার স্থান মুখ্য হলেও ওই আদর্শ আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ নিখুঁত আদর্শ নয়, ও-দুটি আদর্শ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। দুটি আদর্শের মধ্যেই স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট গুণপনা আছে, কিন্তু দুটিই স্বতন্ত্র বিচারে খণ্ডিত, একদেশদর্শী। দুইয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটলে তবেই শুধু প্রকৃত সাহিত্যাদর্শের সমীপবর্তী হওয়া সম্ভব।

সাহিত্যে বাস্তবতা

সেদিন আমার কোনও এক বিশিষ্ট সাহিত্যামোদী বন্ধু আমাকে বলছিলেন, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এই যে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত আর অবজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনা নিয়ে ক্রমাগত গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে, এ জিনিস তাঁর ভাল লাগে না। বন্ধুবরের বক্তব্য এই যে, পরের পর দুঃখ আর নৈরাশ্যমূলক রচনা পড়তে পড়তে মনের ভিতর হাঁফ ধরে যায়, সর্বদাই একটা জগদ্দল পাথরের ভার বুকের উপর চেপে থাকে, জীবনে দুঃখ-বেদনা ছাড়াও যে আর একটা দিক আছে—সৌন্দর্য আর আনন্দের দিক—সে কথা আদপে মনেই হয় না, ফলে সমসাময়িক সাহিত্যপাঠের দরুন গরল পান করাই শুধু সার হয়।

কতকটা এই ভাবের কথা পনেরো-ষোল বছর আগে এক আজন্ম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ায় বর্ধিত উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সাহিত্যিকের মুখেও শুনেছিলাম। আরও পরে, খুব সম্ভব দ্বিতীয় যুদ্ধের সমাপ্তিতে, সুপরিচিত লেখক শ্রীবুদ্ধদেব বসু 'পূর্বাশা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় "চাই আনন্দের সাহিত্য" বলে দুঃখবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। চাই আনন্দের সাহিত্য, অর্থাৎ এমন সাহিত্যের অনুকূলে বসু মহাশয় তাঁর পক্ষপাত ঘোষণা করেছিলেন, যে সাহিত্য জীবনের শুভংকরতায় পাঠকের আস্থা ফিরিয়ে আনে, তার মন জীবনপ্রীতি আর আশাবাদে ভরে তোলে। এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় পৃথিবীর বিচিত্র সুখানুভূতি আর সৌন্দর্যের আকর্ষণ যদি দুঃখবাদের আতিশয্যে ভুলেই থাকা গেল, তা হলে আর সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া কেন। সংসারে দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, ক্লেদ আর কদর্যতার অন্ত নেই; সাহিত্যেও যদি সেই একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করতে হয়, ওই সকল বিমর্ষ অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে সুস্থ ও সুন্দর আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার সম্ভাবনা যদি নাই থাকে, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যের সংস্পর্শে

দু'দিনেই হাঁফ ধরে যাওয়া বিচিত্র কী। সুতরাং চাই সাহিত্যের প্রচলিত আবহাওয়ার শোধন, আনন্দের উদ্বোধন। চাই আনন্দের সাহিত্য।

এ সমস্ত যুক্তি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উল্লিখিত তিন বিশিষ্ট জনের মনোভাবেই যে ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে তাকে কোনক্রমেই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত ইচ্ছা বলা যায় না। বাস্তবিক, দুঃখকে এড়াবার ইচ্ছা অপেক্ষা সুস্থ আকাঙ্ক্ষা আর কী হতে পারে—কি জীবনে, কি সাহিত্যের পাতায়? বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্যই তো হল আনন্দ। সাহিত্যে যাঁরা সর্বাবস্থায় আনন্দ অনুসন্ধান করেন তাঁদের আমরা রোমান্টিক কিংবা অব্যাহতিবাদী যে নামই দিই না কেন, এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, এই দ্বিবিধ শ্রেণীর মানুষ তাঁদের মনোভঙ্গীর মধ্য দিয়ে নিতান্ত সুস্থ আর স্বাভাবিক ইচ্ছারই পোষকতা করে থাকেন। কুশ্রীতা আর মালিন্যের পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে কে চায়? অসুন্দর পরিবেশের কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাওয়াটাই রোমান্টিক তথা অব্যাহতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা। সমসাময়িক জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে রূপকথা আর মধ্যযুগীয় প্রশস্ততা আর বর্ণসমারোহের জগতে উত্তীর্ণ হতে তাঁরাই চান যাঁদের মন এ যুগের সঙ্কীর্ণতায় আর বৈচিত্র্যহীনতায় বিশেষরূপে ক্লান্ত। অতএব বিশুদ্ধ আনন্দ সন্ধানের মধ্যে দোষাবহ কিছু নেই।

কিন্তু কথা তা নয়। বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের গুণাগুণের প্রশ্নটিকে আমরা সাহিত্যের প্রসঙ্গে কোনক্রমেই উড়িয়ে দিতে পারি না। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়, জীবনের যথাযথ রূপটিকে ওই দর্পণে প্রতিবিম্বিত করাই যদি সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হয় তা হলে কেমন করে বর্তমানের সত্য পরিস্থিতির প্রতি পিঠ দিয়ে থাকা সম্ভব? সমাজ-বাস্তবতা (Social Realism) রূপ যে সাহিত্যাদর্শ আজকের দিনে সর্বশেষে কৌলীন্যলাভ করেছে, তার উদ্ভব শূন্য থেকে হয় নি, এক তীব্র প্রয়োজনবোধ থেকেই তার জন্ম। এ প্রয়োজন সাহিত্যেরও বটে, সমাজেরও বটে। সাহিত্য বাস্তবানুগ না হলে সাহিত্য-অনুশীলনকারী ব্যক্তির ভিতর যে সত্য আর

যুক্তিনিষ্ঠ মনটি আছে, তা তৃপ্ত হয় না; পক্ষান্তরে সমাজের যথাযথ চিত্র সাহিত্যে রূপায়িত না হলে সাহিত্যের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধে কমতি ঘটে। সাহিত্য সমাজকে নিয়ে অযথা কল্পনাবিলাসের প্রশ্রয় দিলে সমাজ সাহিত্যকে ক্ষমা করে না। বাস্তব-অসঙ্গত সাহিত্যের ধারাধরন বিশুদ্ধ নন্দনবাদীকে তথা কবিকে তথা রোমান্টিকভাবাপন্ন ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তির প্রত্যাশা যে তার দ্বারা বহুলাংশে অতৃপ্ত থাকে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে বোঝা দরকার। সমাজ-বাস্তবতার আদর্শকে আজ আর একটা গৌণ আদর্শ বলে উড়িয়ে দেওয়ার যো নেই। সমাজের পরিধির মধ্যে নানা কার্যকারণের সমবায়ে এই মুহূর্তে যদি কুশ্রীতা আর মালিন্য, অভাব আর রোগ-জরা, হিংসা আর বিদ্বেষেরই প্রাধান্য ঘটে থাকে, তা হলে কোন্ যুক্তিতে আমরা সাহিত্যে তাদের অপাংক্তেয় করে রাখব? বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে তাদের পাশ কাটাবার কী যুক্তি থাকতে পারে? সাহিত্যের গল্পোপন্যাসের বিভাগটিতে বাস্তবতা নিয়েই মূলতঃ কারবার; সমাজের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কথাসাহিত্যিক সাধারণতঃ তাঁর রচনার মালমসলা আহরণ করে থাকেন। যে লেখকের পর্যবেক্ষণ যত নিবিড় ও সূক্ষ্ম, সেই লেখকের কথাসাহিত্যের প্রাকার তত দৃঢ় ভিত্তির উপর গাঁথা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই পর্যবেক্ষণ কাল্পনিক বস্তু নিয়ে স্ফূর্তি লাভ করে না, বাস্তবতার মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠ স্ফূর্তির সঙ্কেত নিহিত। পর্যবেক্ষণকারীর পক্ষে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন কিছুকেই মাত্র পর্যবেক্ষণের আওতার মধ্যে আনা সম্ভব; পর্যবেক্ষণ শূন্যে বিলম্বিত হতে পারে না।

এই যদি পর্যবেক্ষণক্রিয়ার স্বরূপ ও ধর্ম হয়, তা হলে সাহিত্যে, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে বাস্তবতার প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব। আজকের সমাজের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? বাংলা দেশের সমকালীন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন্ সত্যের প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করে? সে কি এই নয় যে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে গেছে; নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ নিষ্করুণ জীবনসংগ্রামের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, পর্যুদস্ত; শ্রমিক, কৃষক তথা সর্বশ্রেণীর খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের ভিতর আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ জাগ্রত হয়েছে? যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে আগত শ্রেণীবদ্ধ দুর্দৈবের চাপে গত পনেরো বছরে বাঙালী-মানসিকতার দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তার ভিতর বিমর্ষতা ও অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, কোন ঔপন্যাসিক যদি তাঁর রচনার মাধ্যমে এই সমাজের যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে চান তা হলে তাঁকে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা আর ব্যর্থতা, নিম্নবিত্ত জীবনের অবক্ষয় আর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী মনোভাবের বার্তা ঘোষণা করতেই হবে। এবং যে অনুপাতে তাঁর রচনায় মেহনতী মানুষের আত্মনির্ভরতার চিত্র থাকবে, তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের পরনির্ভরতা আর পরশ্রমজীবিতার চিত্রও তাঁকে সেই অনুপাতে পরিবেষণ করতে হবে সমাজ-সত্যকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, অফিসার প্রভৃতি হোমরা-চোমরা নূতন ধনী শ্রেণীর ঔদ্ধত্য, অবিনয় আর বিলাসপ্রীতির চিত্রও সত্যনিষ্ঠার খাতিরে সেই সঙ্গে ধরে দেওয়া চাই। এ না করে তার বদলে এক কল্পিত সুখস্বর্গের চিত্র তুলে ধরলে আমাদের মজ্জাগত স্বপ্নালুতার প্রবৃত্তিতে হয়তো সুড়সুড়ি দেওয়া হবে কিন্তু বাস্তবপ্রীতির আদর্শ থেকে আমরা নিশ্চয়ই তদ্দরুন স্খলিত হয়ে পড়ব। সত্য যতই অপ্রিয় আর তিক্ত হোক, তাকে খোলাখুলি প্রকাশ করার মধ্যে মানুষের সত্যাগ্রহের পরিচয়, সৎসাহসের পরিচয়। পাছে লোকে অস্বস্তিকবলিত হয়, পাছে অপ্রিয় সত্যের সংস্পর্শে লোকের আহার-নিদ্রা অন্তর্হিত হবার উপক্রম হয় সেই ভয়ে প্রকৃত তথ্য চেপে রাখা মিথ্যাচারেরই সামিল। সত্য গোপন করাটা যেমন বিচ্যুতি, তেমনি যা সত্য নয় তাকে সত্যের রাঙতা মুড়িয়ে প্রকাশ করাটাও বিচ্যুতি। বালির ভিতর মুখ গুঁজে ঝড়কে অস্বীকার করবার উটপাখিসুলভ অভ্যাসের মতই এ জিনিস মূঢ় ও হাস্যকর।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারীতির সঙ্গে পাঠকবর্গ সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। আমাদের সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর অনেক গল্পের মধ্যেই এমন একটা grim realism-এর ছাপ আছে, যা সাধারণ রূপকথা আর আষাঢ়ে-গল্প আর 'শেষের কবিতা' আর অবন-ঠাকুর-পড়ুয়া রোমান্টিক মেজাজের পাঠকের মনে হাঁফ ধরিতে দিতে পারে। অবাস্তব 'ভারতী' যুগ আর অতিমাত্রায় ইনটেলেকচুয়াল 'সবুজ পত্র' যুগের আবহাওয়ায় তৈরী পাঠকমনের ভিতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বীতস্পৃহা ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোন মনোভাবেরই উদ্রেক করবে না। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার চাইতে সোয়াস্তি ভাল এই নীতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, সাহিত্যের সেই সব goody-goody আয়েশী পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরদাস্ত করতেই হয়তো আদপে রাজী না হতে পারেন। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর সাহিত্যেই বর্তমান বাঙালী সমাজের প্রকৃত রূপ সবচেয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই উদ্‌ঘাটন নিষ্ঠুর হতে পারে, মানসিক শান্তির বিঘাতক হতে পারে, কিন্তু তা যথার্থ শিল্পী আর সত্যসাধকের নিরাসক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত। কল্পিত অমৃতভাণ্ডের পিছনে অযথা না ছুটে এই সত্যপ্রয়াসী লেখক বর্তমান বাঙালী সমাজ-জীবনের বিক্ষুব্ধ বারিধি থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ গরল পান করে নীলকণ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন। নীলকণ্ঠ তিনি হতে পারেন নি তবে তাঁর কঠোর সত্যান্বেষণস্পৃহাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। সমসাময়িক সমাজের ক্লেদ-পঙ্ক আর গ্লানি-মালিন্য যদি মানিক-সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে বুঝতে হবে তার বস্তুগত একটা ভিত্তি আছে; নিছক ক্লেদ ঘাঁটবার জন্যই তিনি ক্লেদ ঘাঁটেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যখন কোন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বধূ দরজার আড়াল থেকে ফেরিওয়ালার সঙ্গে শাড়ি-কাপড়ের দাম নিয়ে দরদস্তুর করে, কুলবধূসুলভ সস্তা ব্রীড়াভঙ্গির জন্য এ আচরণ নয়, এ আচরণের মূলে নারীত্বের চরম লজ্জা আর বেদনা নিহিত রয়েছে। শতচ্ছিন্ন 'ত্যানা'র আবরণে জড়ানো দেহকে ইচ্ছা করলেই কি

অন্তরালমুক্ত করা যায়? যুদ্ধকালীন বস্ত্রসঙ্কটের ভয়াবহতা আর সাধারণ মানুষের দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে তোলবার জন্য এই গল্পের অবতারণা—সমাজের নানাবিধ আপাত-রম্য ছবি এঁকে যাঁরা আত্মপ্রসাদ বোধ করেন, তথাকথিত বালিগঞ্জীয় 'ড্রইং-রুম সোস্থাল'-এর কাহিনী বর্ণনায় যাঁদের লেখনীর সমধিক স্ফূর্তি, তাঁরা কি জীবনেও কখনও এই realism-এর তল খুঁজে পাবেন?

কিংবা, মানিকবাবু যেখানে "পাশ-ফেল-সংবাদ" গল্পে পুত্রের আই. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্যতাকে পরিবারের পক্ষে স্বস্তির কারণ বলে বর্ণনা করেন, ভুলেও কি সাধারণ রম্য-সাহিত্য-প্রিয় সাধারণ পাঠকের মাথায় এ জিনিস ঢুকবে যে নানাবিধ সমস্যাপীড়িত অভাবজর্জরিত পরিবারের কর্তাকে যে আরও অর্থব্যয় করে ছেলেকে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি এবং পড়ার খরচ চালাবার দায় পোয়াতে হল না সেই একান্ত ট্রাজিক মুক্তির বোধ থেকেই তাঁর মনে ওই আপাত-বিসদৃশ স্বস্তির উদ্ভব? কিংবা স্কুলের জবরদস্ত সেক্রেটারি দরিদ্র মাস্টারকে সায়েস্তা করবার জন্য যখন মাস্টার মশায়ের জীর্ণ গৃহে প্রবেশ করেন, সেখানকার মৃত্যুর করাল ছায়াবিস্তারী নিঃশ্বাসরোধী আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়ে কেন তিনি তাঁর নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ভুলে যান, কেন তিনি অচিরেই ওই অন্ধগুহা থেকে ছুটে পালিয়ে আসেন—সে তত্ত্ব বুঝতে হলে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সাম্প্রতিক শহরে বাঙালী নিম্নবিত্ত জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজিডির গহনে প্রবেশ করতে হবে। বাইরে থেকে এ জিনিস বোঝা যায় না, এ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সমাজ-জীবনের একটি বৃহৎ অংশের মানুষের নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ শরিক হতে হবে, অথবা এ অভিজ্ঞতাকে সত্য বলে স্বীকার করবার মত মানসিক গ্রহিষ্ণুতা আর কল্পনাশক্তি অর্জন করতে হবে। কল্পনাশক্তিকে নিছক কাল্পনিকতার শূন্যেই যদি কেবল উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির বোধ আমৃত্যু আমাদের অ-ধরা হয়েই থাকবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী আরও দুই-চারিজন লেখকের নাম করব। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্তোষকুমার

ঘোষ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বাইশে শ্রাবণ" গল্প কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত সংসার-জীবনের রূঢ় বাস্তবতার এক অসাধারণ আলেখ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মূলতঃ স্বপ্নজীবী কবিধর্মী লেখক, তবে "বাইশে শ্রাবণ", "ভাঙা চশমা" প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তাঁর বাস্তবতা-বোধ চূড়ান্ত শিল্পসৌন্দর্যের গ্রামে উন্নীত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন শিল্পী। তাঁর রচনায় শহুরে নিম্নবিত্ত জীবনের মাধুর্য ও বেদনা দুইই ধরা দিয়েছে, তবে খতিয়ে দেখতে গেলে বেদনার পরিমাণই বেশী। এ কথা অবশ্য সত্য যে, নরেন্দ্রনাথের কল্পনা ও মনন গণ্ডীবদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে সহজে প্রসারিত হতে চায় না, তবে নিম্নবিত্ত জীবন যখন আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য স্তর এবং তার পরিধি নাগরিক জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, তখন সে সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীনতারও কোন যুক্তি নেই। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ওই বিশেষ শ্রেণী-সম্প্রদায়ের দাবীর প্রতি অবহিত থেকে ওই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের সম্মান অর্জন করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একাধিক রচনায় নির্মম সমাজ-বাস্তবতার ছাপ প্রত্যক্ষ। সন্তোষকুমার ঘোষ বিষয়নির্বাচনে অনেকটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরই সমধর্মী লেখক, তবে দুয়ের রচনারীতি আলাদা।

উল্লিখিত লেখকদের সমাজ-বাস্তবতার অনুকূলে প্রশংসাবাক্যের মানে এ নয় যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আমি পূরাপূরি সমর্থন করি। এঁদের ভিতর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাদ দিলে আর সকলেই অল্পবিস্তর দেহবাদের পরিপোষক। বিশেষতঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় দেহবাদের প্রতি প্রবণতা যতটা দৃষ্টিগ্রাহ্য ততটাই দৃষ্টিকটু ঠেকে। আরও পরেকার সারির কয়েকজন লেখক এই ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা দেহবাদের আদৌ সমর্থক নই। নরনারীর যৌন জীবনের নগ্ন চিত্রকে সমাজ-বাস্তবতা নামে অভিহিত করলে সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের অপমান করা হয়। সমাজের অলিতে-গলিতে, অন্ধকার রন্ধ্রে ও কোটরে কত যে বীভৎস

বিকারের অনুষ্ঠান হচ্ছে অতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণপরায়ণ লেখকের পক্ষেও তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলে সেই সব বিকারের চিত্র পাঠকসমক্ষে উপস্থাপনের যৌক্তিকতা নেই। দৈনন্দিন ও সাংসারিক জীবনের নিতান্ত স্থূল দিক—তথাকথিত আহার-নিদ্রা-মৈথুনাসক্তির দিক—সাহিত্যের এলাকার মধ্যে পড়ে না। জীবনে যা-কিছু ঘটে তা-ই সাহিত্যের পাতায় চিত্রিতব্য নয়। সংসারের বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবের ষোল-আনা মিল আশা করলে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গের জঞ্জাল দ্বারা সাহিত্যের আঙিনাকে ভরে তোলা হয়। তেমন বাস্তবতার প্রতি আমাদের সায় নেই। বাস্তবতা বলতে আমরা বুঝি জীবনের ভাবালুতাবর্জিত সত্যনিষ্ঠ চিত্র, এ চিত্র বাস্তবসম্মতও বটে আবার শিল্পসম্মতও বটে। সাহিত্যে যা-ই চিত্রিত হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই সাহিত্যের স্বকীয় উৎকর্ষের দাবী অগ্রাহ্য করা চলবে না। অনেক গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্যিক উৎকর্ষের উচ্চগ্রামে পৌছুতে হয়; অন্ধ মসীজীবী কেরানীর ন্যায় জীবনের তাবৎ ব্যাপার সাহিত্যে হুবহু অনুকরণ করতে চাইলে সে জিনিস ফোটোগ্রাফী হয়তো হবে, সাহিত্য হবে না। বিশল্যকরণী আনবার নামে গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনলে বুদ্ধি এবং রুচি দুইয়েরই স্থূলতার প্রমাণ দেওয়া হয়।

শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিশিষ্ট কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন কিছুকাল হল। গত কয়েক মাস ধরে এই শক্তিমান লেখকের সাহিত্যকৃতি, শিল্প-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা হয়েছে। সে সব আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোচকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারক্রিয়ার পার্থক্য যতই অভিব্যক্ত হোক, এই এক বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত হয়েছেন যে, মানিকবাবু রিয়ালিস্ট লেখক ছিলেন এবং সাহিত্যে তাঁর নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল।

স্পষ্টতঃই এ দুটি বিচার এক পর্যায়ের নয়। মানিকবাবু রিয়ালিস্ট ছিলেন এটি তাঁর সাহিত্যের বিচার; অন্য পক্ষে তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক নিষ্ঠা তাঁর জীবনের বিচার। এ দুটিকে একত্র গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই, যদিও মৃত্যুর অব্যবহিত সান্নিধ্যে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমরা এ দুটি বিচার-ক্রিয়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। আজ শোকের গাম্ভীর্য ও গভীরতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হয়েছে, শোকাহত চিত্তের উক্তি ও যুক্তির মধ্যে নিরপেক্ষতার আবহাওয়া সঞ্চালিত হবার মত যথেষ্ট সাময়িক অর্থাৎ কালগত ব্যবধান রচিত হয়েছে। সুতরাং যতদূর সম্ভব অপক্ষপাত মনোভাব (যতদূর একজন লেখকের সাধ্যে কুলায়) নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি ও ব্যক্তিত্বের উপর একনজর চোখ বুলনো সম্ভবতঃ আজ আর বেমানান ঠেকবে না। বর্তমান নিবন্ধে আমি সেই চেষ্টাই করব।

২

রিয়ালিজম-এর প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করা যাবে। গোড়ায় মানিকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের ধারা পর্যালোচনা করে আমার যে কথা বরাবর এবং বার বার মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই, এই লেখক অতিশয় সৎপ্রকৃতির শিল্পী ছিলেন, এঁর মনের গড়ন ছিল আদর্শবাদীর। বাজি ধরে সেই যে তিনি প্রথম যৌবনে সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন তারপর আর কোন কারণেই সাহিত্যকে ত্যাগ করার কথা তাঁর মনে হয় নি। এ দেশে সৎসাহিত্য-সেবার অবধারিত পুরস্কার দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের ভয় মানিকের সাহিত্যনিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে পারে নি। দারিদ্র্যের ভয় তো শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের অভাবের ভয়ই নয়, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক ঔদাসীন্য আর অবহেলা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান, অনৈশ্চিত্যের ভীতি আর কর্মকুশলতার হানি। এ সমস্তর আশঙ্কা মেনে নিয়েই তিনি সাহিত্যের সেবায় অবিচল ছিলেন। অসার লোকখ্যাতি আর সামাজিক কৌলীন্যের লোভে তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার পথে পা বাড়ান নি। তিনি যে ধরনের সাহিত্যরচনায় অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যে মনোবিশ্লেষণ তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল, তা সর্বাংশে জনমনের গ্রহণীয় নয় জেনেও তিনি ওই সাহিত্যরীতি থেকে বিচ্যুত হবার কথা কখনও চিন্তা করেন নি। হয়তো তাঁর অন্যবিধ সাহিত্যরচনার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, কিংবা একেবারেই ছিল না; কিন্তু আটাশ বছরের একটানা সাহিত্যিক জীবনে তিনি যে শুধু ওই একই প্রকারের মনস্তত্ত্বমূলক গল্পোপন্যাস রচনার আদর্শে স্থিতচিত্ত ছিলেন, তাতেই তাঁর অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আসল কথা, মানিকবাবু চরিত্রে ও বিশ্বাসে মোটেই সুবিধাবাদী ছিলেন না। আমাদের সাহিত্যে সুযোগসন্ধানী, যে-কোন-মূল্যে-সাফল্যপ্রয়াসী লেখকের সংখ্যাই অধিক। এঁদের মত মানিকবাবু দুদিন বাদে বাদে ফ্রন্ট বদলান নি। মানিকবাবুর শিল্পগত বিশ্বাসের যৌক্তিকতায় আমার তেমন আস্থা নেই, কিন্তু মানতেই হবে যে, তাঁর বিশ্বাস ভুল হোক শুদ্ধ হোক, তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই দৃঢ়তা অন্যান্য লেখকদের মধ্যে থাকলে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের চেহারা ভিন্নরূপ হত। নেই, দেশবাসীর দুর্ভাগ্য!

মানিকবাবুর চরিত্রের এই আদর্শবাদ আমাকে একান্তভাবেই আকর্ষণ করে। তিনি যে-সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির পরিপোষক ছিলেন তার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেখকের নিরাবরণ বাস্তবতার আদর্শ পূরাপূরি মেনে নেওয়া কঠিন; কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য মূল্য দিয়েছেন, ওই বিশ্বাসকে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবায়িত করে তুলতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি-ত্যাগ স্বীকারেই পশ্চাদ্‌পদ হন নি। সংশ্লিষ্ট মহলের বিরাগ-ভাজন হবার ঝুঁকি নিয়ে পুনরায় বলছি, এই গুণ আমাদের সাম্প্রতিক লেখক-সমাজের মধ্যে অতিশয় বিরল। অদ্যকার অধিকাংশ লেখক শিল্পেরই শুধু সাধনা করেন, জীবনের সাধনা করেন না। শিল্প যে জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত—এই বোধের পরিচয় ক্বচিৎ-কখনও তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া গেলেও তাঁদের নিজ জীবনে পাওয়া যায় না। তাঁদের নিজ নিজ জীবন বৈষয়িকতার এক-একটি মূর্ত প্রতীক। মানিকবাবুর চরিত্রে ওই অশিল্পীজনোচিত বৈষয়িক বুদ্ধির একান্তই অসদ্ভাব ছিল। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবের ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। এতে তাঁর শিল্পজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে তিনি নিজের ভালমন্দও বুঝতে শেখেন নি। ত্যাগধর্মী সেবার আদর্শ সামনে রেখে দেশকে অমৃত বিলোবার আশায় তিনি নিজ জীবনে অপরিমিত মাত্রায় দুঃখের গরল পান করেছিলেন; কিন্তু এমনই তাঁর আদর্শবাদের আতিশয্য ও উগ্রতা যে, ওই গরল শুধু তাঁর ব্যক্তি-জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর জীবনপাত্রের কানা উপচে সে গরলের ছিটে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে এসেও লেগেছিল। সকল প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত তিনিও তাঁর সাহিত্যের ভাণ্ডে অমৃতই পরিবেষণ করতে চেয়েছেন, পরিতাপের বিষয় তাঁর বেলায় ওই সাহিত্যামৃত কথঞ্চিৎ বিষদুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক রিয়ালিজম-ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্পজীবনে সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই বিচ্যুত করেছে। এমন কি, মধ্য ও শেষের দিকের লেখায় তিনি সচেতন-

ভাবে অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অন্যায় হয় না। একজন অসাধারণ মনোজীবী শক্তিমান লেখকের পক্ষে জেনে-শুনে অশুভের-পথে-পা-বাড়ানো-রূপ ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু মানিকবাবুর স্বভাবের আত্যন্তিক আদর্শবাদী স্বরূপের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে তিনি লেখকের এই পরিণতিতে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হবেন না। মানিকবাবু প্রকৃতিতে অতিশয় সৎ ছিলেন বলেই তিনি তাঁর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবটুকু সরেজমিনে পরিমাপ করতে পিছপাও হন নি, আর হন নি বলেই অশুভের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেও তাঁর ভয় হয় নি। যে বিশ্বাসের ভূমিতে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই বিশ্বাস পরখ করতে গিয়ে মধ্যপথে ছেদ টেনে হার স্বীকার করবার মত দুর্বলচেতা লেখক তিনি ছিলেন না। তাঁর চারিত্রিক গঠনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সততারই নামান্তর। যদিও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে মানিকবাবুর এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কখনও পরিমার্জনা লাভ করতে পারে নি, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, ওই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সহায়েই তিনি শুভাশুভমিশ্রিত জীবনের সমগ্র রূপটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। মানিকবাবু কেমন করে লেখক হলেন সে গল্প নিজমুখেই বিবৃত করেছেন। সেই বিবরণ থেকে জানা যায়, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এক ধরনের আত্মপ্রসাদ এই অনুরাগকে ঘিরে ছিল। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক ওই আত্মপ্রসাদ মানিকবাবুর প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে, কেন না ওই আত্মপ্রসাদের হাতছানিতে ভুলেই তিনি মানবীয় ব্যবহার ও মনস্তত্ত্বের অন্ধিসন্ধি পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীজনোচিত অনাসক্তির সহিত অশুভের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে তিনি শেষ অবধি অনাসক্তি বজায় রাখতে পারেন নি। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি ক্লেদরতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। আত্মতুষ্টির হাতে-ধরা হয়ে তিনি যে ফাঁদে একবার পা দিলেন, সে ফাঁদ থেকে তাঁর সারা জীবনে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

৩

রাজনৈতিক বিশ্বাসের নিষ্ঠায় শুধু যে মানিকবাবুর শিল্পীমানসের পরিবর্তন হয়েছিল তাই নয়, তাঁর ভাষাভঙ্গীরও আমূল রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। মানিকবাবুর ভাষা কোন সময়েই সুন্দর ছিল না। এমন কান্তি ও চারুতা-বর্জিত ভাষা কাঠখোট্টা প্রবন্ধ-লেখকের কলমেও যোগায় না। তার উপর ওই ভাষা ছিল একান্তভাবেই তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর বাহন, ফলে ও-ভাষার মধ্যে ট্রাডিশন কিংবা সাম্প্রতিক রচনারীতি কোনটিরই তেমন প্রভাব পড়ে নি। মানিকবাবুর চিন্তা করবার ধরনটি ছিল যেমন একেবারেই স্ব-তন্ত্র, অন্য কোন লেখকের চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে আদৌ মেলে না, তেমনই তাঁর ভাষাও ছিল তদনুরূপ। লেখকের রোমান্টিসিজমের ধাত মোটে ছিল না। বস্তুতঃ, সর্বপ্রকার রোমান্টিসিজমের প্রতি তাঁর মনে প্রচণ্ড বীতস্পৃহা ছিল। যে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসকে লেখক স্বয়ং "প্রেমকে ভিত্তি করে লেখা বই" বলে অভিহিত করেছেন এবং কুড়ি-একুশ বছরেই ওই-জাতীয় প্রেমের গল্প লেখা শোভা পায় বলে মত প্রকাশ করেছেন, সেই বইয়ের ভিতরও বাজারচলতি প্রেমের ধারণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ওতে প্রেমিক-প্রেমিকার গহনগূঢ় রহস্যে আবৃত অর্ধ-জাগ্রত-অর্ধ-সুপ্ত মনের জটিলতার জট খোলাই লেখকের প্রধান ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইটি 'দিবারাত্রির কাব্য' হলেও তার মধ্যে গতানুগতিক কাব্যের আমেজ সামান্যই পাওয়া যায়। বইটির অংশবিশেষ সম্পর্কে 'আত্মস্মৃতি'র লেখক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যথার্থই লিখেছেন, এটি এমন এক মনের রচনা "যে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ।" মানিকবাবুর কুটিল জটিল অসাধারণ মননের ছাপ তাঁর ভাষাভঙ্গীর উপর অতি-সুস্পষ্ট। এবং বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় মননক্রিয়ার যা দোষ ও গুণ, অবধারিতভাবে তা তাঁর ভাষার উপরেও বর্তিয়েছে। মানিকবাবুর মননক্রিয়া কুটিল বলেই তাঁর লেখার ভিতর প্রসন্নতা নেই, সরসতা তার চেয়েও কম মাত্রায় উপস্থিত। 'দিবারাত্রির কাব্যে' লেখক এক জায়গায় লিখছেন—

"এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়। তার এ কি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? এ কি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।"

কথাগুলি খোদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও সর্বাংশে প্রযোজ্য। আত্যন্তিক মনোবিশ্লেষণের অভ্যাস লেখকের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীলতার ফলে যেমন কখনও-কখনও দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তেমনই অপরিমিতমাত্রিক মনোব্যবচ্ছেদের প্রবণতাও জীবনের সহজ আনন্দকে বিষাক্ত বিস্বাদ করে দিতে পারে। প্রমাণ হাতড়াবার জন্য দূরে যেতে হবে না, মানিক-সাহিত্যই সেই জলজ্যান্ত প্রমাণ। এই ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানোক্ত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রীতি অনুযায়ী মানিকবাবুর সাহিত্য ও জীবন দুই দুইকে প্রভাবিত করেছে। মানিকবাবুর উৎকট মনোবিশ্লেষণের ব্যাধি তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা হরণ করে তাঁর সাহিত্যের প্রসন্নতাও সেই সঙ্গে হরণ করেছে, উলটো তাঁর সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক মনোজীবিতা মন নামক অদ্ভুত পদার্থটি ছাড়া আর কোন বিষয়েই লেখককে সচেতন হতে দেয় নি। মানিকবাবু যদি আর-একটু বহির্মুখী হতেন, কী চমৎকারই না হত! সে ক্ষেত্রে শুধু যে তাঁর morbidityরই শোধন হত তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাভঙ্গীরও শোধন হত, ভাষার ভিতর কান্তি, ঔজ্জ্বল্য আর প্রসাদগুণের আবির্ভাব ঘটত। প্রথম দিককার লেখায় তবু যা-হোক কিঞ্চিৎ ধ্বনিময়তা, সৌন্দর্যবোধ, পরিচ্ছন্ন বিন্যাসের চেতনা উপস্থিত ছিল; শেষের দিকের ভাষাভঙ্গী রসহীন উৎকট বাস্তববাদের রৌদ্রদাহে একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে উঠেছিল। মিষ্টত্বের নামগন্ধও তাতে ছিল না।

এ উক্তি যে নিতান্ত কথার কথা নয়, তা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং

তার বহু বৎসর পরের লেখা 'ইতিকথার পরের কথা' বই দুটির ভাষাভঙ্গী মিলিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে। প্রথমের ভাষায় আছে মানবমনের জটিলতার নিখুঁত শিল্পীজনোচিত প্রকাশকুশলতার ছাপ; দ্বিতীয়ের ভাষা কাটা-কাটা, ভাঙা-ভাঙা, লেখকের মানসিক আলস্যপ্রসূত লেখনীসঞ্চালন-বিমুখতার দ্বারা পদে পদে আড়ষ্ট। বাক্যের ব্যবহারে ব্যয়কুণ্ঠা এ ক্ষেত্রে শিল্পসচেতনতার প্রমাণ না হয়ে নৈরাশ্যবাদ তথা জাড্যের প্রমাণ হয়েছে। মনে হয় অন্তর্বর্তী বৎসরগুলিতে লেখকের মনোজীবনে এমন এক গভীর বিপর্যয় ঘটে গেছে, যার ছাপ তাঁর ভাষার মধ্যেও গোপন থাকে নি। শেষের পর্যায়ের মানিক-সাহিত্যের ভাষাভঙ্গী অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, যে মন এই ভাষাভঙ্গীর জন্মদাতা সে মন ক্লান্ত, হতাশ, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে লেখনী-সঞ্চালনে অনিচ্ছুক। গভীরভাবে সৎ এবং আদর্শবাদী হওয়া সত্ত্বেও শেষের দিকে তিনি আত্মপ্রকাশের তাগিদ হারিয়ে ফেলেছিলেন। উপরের নামীয় 'ইতিকথার পরের কথা' বইটিই শুধু নয়, তাঁর অকালে-নিঃশেষিত জীবনের শেষের পর্বের যে-কোন বই-ই আমার এ কথার সাক্ষ্য দেবে বলে মনে করি। মানিকবাবুর সর্বশেষ রচনাগুলির অন্যতম রচনা 'শুভাশুভ' (১৩৬১) এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে রয়েছে। এ বইটির অজস্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির ফাঁকে এমন একটি অনুচ্ছেদ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে পূর্বতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভার ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায়। বেশী কি কথা, এমন যে একুশ বছরের রচনা 'দিবারাত্রির কাব্য', তার মধ্যে যে উপলব্ধির গভীরতা আছে তাঁর অনেক পরবর্তী রচনাতেই তা সুদুর্লভ। শেষের দিকে মানিকবাবু একান্তভাবেই রুদ্র-রুক্ষ সমাজ-বাস্তবতার কক্ষাশ্রয়ী, সেই সঙ্গে নগ্নতার পরিপোষক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গোড়ায় তাঁর ভিতর এ জিনিস ছিল না—একটা সহজ চিন্তাশীলতার সঙ্গে অনুভূতির প্রগাঢ়তা মিশে তাঁর রচনাভঙ্গীর মধ্যে শিল্পকুশলতার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই অভিব্যক্তিরই অন্যতর প্রমাণ 'দিবারাত্রির কাব্যে'র নিম্নবর্তী অনবদ্য লাইনগুলি—

"...পরিপূর্ণ প্রেমের অনন্ত দাবী মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। অভিজ্ঞতায় প্রেমের খোরাক নেই, মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি প্রেমকে টিকিয়ে রাখার শক্তি নয়। নারীকে নিয়ে একদিনের জন্যও যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় বলে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপর শুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, সমস্ত হৃদয় এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারও বেলা এর অন্যথা নেই।"

অনেকে মানিকবাবুর শিল্পক্ষমতার ক্রমাবনতির মূলে তাঁর কোন এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলবিশেষে যোগদানকে কারণ স্বরূপে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এটি নিতান্তই বহিরঙ্গের বিচার, এ দিয়ে কোন প্রতিভাবান শিল্পীর মানসিক উর্ধ্বগতি কিংবা অধোগতির রহস্য বোঝা যায় না, বোঝবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। শিল্পীর মন এরূপ বাইরের কারণকে আশ্রয় করে ধরাবাঁধা পথে অগ্রসর হয় না, তাঁর মনের গতি অতি-সূক্ষ্ম অন্তর্লোকের লীলার অধীন। লোকচক্ষুর অগোচর সেই গুহাহিত লোকে কিসে যে কী হয়, তা অন্যে তো দূরে থাক্, স্বয়ং শিল্পীও জানতে পারেন না। রাজনীতি শিল্পীর জীবনে নিতান্তই বাহ্য একটি ব্যাপার। আমরা সামাজিক বিচারে যেমন কেউ ব্রাহ্মণ কেউ বৈদ্য কেউ কায়স্থ অথচ আমাদের কর্মজীবনের উপর এই বিভেদগুলির প্রভাব সামান্যই, তেমনই রাজনীতি মানুষের জীবনের উপরকার একটি লেবেল মাত্র। ওই লেবেলের সাহায্যে শিল্পীর পরিচয় নিতে যাওয়া ভুল। যাঁরা মানিকবাবুর ক্রমিক অপকর্ষের মূলে রাজনৈতিক হেতু ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না তাঁরা মানিকবাবুর সমালোচনার নামে রাজনৈতিক দলবিশেষেরই সমালোচনা করেন এবং এতদ্দ্বারা ওই দলের প্রতি স্বীয় চিত্তের মজ্জাগত বিমুখতাই প্রদর্শন করেন মাত্র। উক্ত দলবিশেষের প্রতি আমাদের

যত প্রতিকূল মনোভাবই থাকুক, অবান্তর প্রসঙ্গের দ্বারা সাহিত্যের বিচারকে ভারাক্রান্ত করবার যুক্তি সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়। শিল্পী-সাহিত্যিকের মনকে যদি এমন ভাসা-ভাসা ভাবে স্পর্শ করে তার অন্তর্নিহিত অতলতার সন্ধান পাওয়া যেত তা হলে আর ল্যাঠা ছিল না।

যা হোক, মানিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের রহস্য আমি যেটুকু এবং যতদূর বুঝতে পেরেছি তা এবারে পাঠকদের সামনে নিবেদন করবার চেষ্টা করব। প্রথম কথা হচ্ছে, মানিকবাবু ছিলেন সর্ব-শ্রেণীর দুর্গত শোষিত জনমানবের অকৃত্রিম বন্ধু। খেটে-খাওয়া সাধারণ মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিতে কোন খাদ ছিল না। তিনি যথার্থই শ্রমিক-কৃষক-শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়ন চেয়েছিলেন এবং ওই কাজে স্বীয় সাহিত্য-সৃষ্টিকে ব্যবহার করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। এ কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফল নয়, যে-কোন অন্যায়-অসহিষ্ণু ন্যায়পরায়ণ হৃদয়বান শিল্পীর এই ধর্ম। হৃদয়ের সম্পদে ধনী শিল্পী সর্বদেশে সর্বকালে অত্যাচারিত শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছেন, মানিকবাবুও তাই করেছিলেন। সুবিধাভোগী সমাজের মানুষের প্রতি তাঁর নিরন্তর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পিছনে সর্বদাই উঁকি দিয়ে গেছে গরিবের দুঃখে দুঃখী ব্যথাকাতর একটি দরদী হৃদয়। ওই হৃদয়কে আমি আমার সশ্রদ্ধ নতি জানাই। কিন্তু যে দরদ ছিল তাঁর শিল্পজীবনের সবচেয়ে বড় পুঁজি, সেই দরদের আতিশয্যই তাঁর বিচার-বিবেচনায় বিভ্রাট ঘটাল। অন্যায়-অবিচার-বিচার বিকারে দাঁড়াল। ভুল করে তিনি ভেবে বসলেন, শোষণ ও হিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজের নগ্ন, গলিত রূপটিকে পরিস্ফুট করে তোলাই বর্তমান অসম-সমাজ-ব্যবস্থার অবসানের শ্রেষ্ঠ উপায়। যেন সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ভূমিকা তৈরির কাজটি একক কোন সাহিত্য-শিল্পীর উপর ন্যস্ত আছে এবং সেই একক শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়! কিন্তু ওভাবে কি সমাজের কাঠামো বদলানো যায়, না, সাহিত্যিক তা বদলাতে পারেন? আদর্শবাদের আতিশয্যপীড়িত মানিকবাবুর মনে এ কথা একবারও কেন জাগল না যে, সমাজের যেমন একটা পচনশীল

গলিত দিক আছে তেমনই একটা সদর্থক দিকও আছে? মানুষের মন শুধু অশুভের সমন্বয়েই তৈরি নয়, শুভের প্রভাবও তার উপর কম গভীর নয়। তা যদি না হত, সভ্যতার অগ্রগতির কোন অর্থই থাকত না। অশুভের অভিব্যক্তিসমূহকে অবদমিত, নিয়ন্ত্রিত, সম্ভবস্থলে নিরাকৃত করতে করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় স্বভাবের সদ্বৃত্তিসমূহকে স্ফুটতর করতে করতেই সভ্যতা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। একচক্ষু হরিণের মত যে শিল্পী শুধুমাত্র জীবনের কদর্যতার উপর তাঁর মনোযোগ স্থাপন করেন তিনি সৎ, আদর্শবাদী, মানবপ্রেমী হয়েও তাঁর সাহিত্যকে খণ্ডিত করেন, অংশতঃ স্বীয় জীবনকেও খণ্ডিত করেন।

শেষোক্ত কথার প্রমাণ মানিকবাবুর নিজেরই জীবন। তিনি যে শিল্প-বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকে চালিত করেছিলেন সেই বিশ্বাসেরই ছিদ্রপথে তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল ট্র্যাজিডি। সমাজের অসুন্দর দিকের উপর মনোযোগ সংহত করার এবং মানুষের মনকে চিরে-ফেঁড়ে তছনছ করে বিশ্লেষণ করার যে অভ্যাস দুরারোগ্য ব্যাধির মত তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেই একমুখী অসুস্থ আবিষ্টতার (obsession) মানসিক ভার তিনি সইতে পারেন নি, ভেঙে পড়েছিলেন। মানিকবাবু যেমন ছিলেন দুঃখী-দুর্গতের অকৃত্রিম সুহৃদ, তেমনই তিনি জনজীবনের স্বার্থের বিরোধী প্রচণ্ড এক অস্বাভাবিক প্রবণতারও পরিপোষক ছিলেন। এই দুই বিপরীত মনোবৃত্তি দুইকে কর্তন করেছিল। মানিক-সাহিত্যে এক বিসদৃশ যোগাযোগ ঘটেছিল—প্রগতিশীল সাহিত্যভাবনার সঙ্গে বিকারগ্রস্ত অসুস্থ ভাবনার যোগ। বলা প্রয়োজন, এই অস্বাভাবিক যোগাযোগের জন্যই মানিকবাবুর প্রগতিশীলতা গভীর আন্তরিকতামণ্ডিত হয়েও পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারে নি। তিনি উদার-মুক্ত ডান হাতে মানবপ্রীতির যে সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দিতে চেয়েছেন, বিকারের উত্তেজনায় কম্পিত বাম হাতে তাকে আবার অনেকখানি প্রত্যাহরণও করে নিয়েছেন। 'মর্বিড' সাহিত্য যে গণ-সাহিত্য নয়, তা যে শেষ অবধি জনগণকে বিপথেই চালিত করে—গণ-সাহিত্যের একজন উৎসাহী

উদ্গাতা হয়েও মানিকবাবু এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, আমাদের আক্ষেপ সেইখানে। নইলে মানিকবাবুর মত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় মণ্ডিত চিন্তারীতির প্রকাশক লেখক আমাদের সাহিত্যে আর কে আছেন? মানিকবাবুর দোষেরও যেমন তুলনা নেই, তেমনই তাঁর শক্তিরও তুলনা নেই। এমন জটিল মনন আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী কথাসাহিত্যিক পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যেও খুব বেশী আছেন বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু লেখকের আত্যন্তিক রিয়ালিজমের বাতিকই তাঁর হিতে-বিপরীত ঘটিয়েছিল। তাঁর চোখে জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তবের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাপপুণ্যের মিশ্রিত চিত্রণই হল খাঁটি জীবনের চিত্রণ—এই মনোভাবের বশে পাপের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সুন্দরের দিকে এমনভাবে পিঠ দিয়েছিলেন যে, পরে চেষ্টা করেও আর সুন্দরকে আবাহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি অসুন্দরের প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন। জনকল্যাণের সদিচ্ছা সত্ত্বেও অসুন্দরকে নিয়ে খেলা করা যে কত বিপজ্জনক মানিক-সাহিত্য আর মানিক-ব্যক্তিত্বই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

৪

আটাশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে মানিকবাবু কিছু কম লেখেন নি। হিসাব করলে দেখা যায়, বছরে তিনি গড়ে দুখানা করে বই লিখেছিলেন। মানিকবাবুর জীবনে যতটুকু শৃঙ্খলা ও নিয়ম ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সৃষ্টির প্রাচুর্য একটু বিস্ময়করই মনে হয়। তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে কোন পরিকল্পনা ছিল না। লিখেছেন তিনি প্রচুর, কিন্তু তাঁর সেই প্রাচুর্যের মধ্যে ভঙ্গীর একঘেয়েমি ছিল—তাঁর সুপরিচিত শোধনাতীত মনোবিশ্লেষণের ঢঙটি সেই একঘেয়েমি এনে দিয়েছিল। ভাষারীতির সংস্কার ও পরিমার্জনের সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন নি, আঙ্গিকের প্রশ্নেও তাঁর মাথাব্যথার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, সাহিত্যিক জীবনের সাফল্য আর অগ্রগতির

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অধিকতর সুশিক্ষিত করে তোলার আত্ম-আরোপিত অবশ্য-প্রয়োজনীয় কর্তব্য কী এক দুর্জ্ঞেয় আলস্যহেতু তিনি বরাবর শিকায় তুলে রেখেছেন, পুঁথি-কেতাবে সন্নিবদ্ধ পরের ভাবনা ভাবার চাইতে নিজের ভাবনা ভাবতেই তিনি সমধিক অভ্যস্ত ছিলেন। এই অভ্যাসের ভালমন্দ দ্বিবিধ ফলই তাঁর সাহিত্যে বর্তিয়েছিল—তিনি অত্যাশ্চর্য রকমের মৌলিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী রচনারীতির আমেজ না থাকায় তা কিছু-পরিমাণে উৎকেন্দ্রিকও ছিল। পূর্বেই বলেছি, তাঁর ভাষায় সুষমা ছিল না। গোড়ায় যেটুকু বা ছিল, আদাজল খেয়ে 'মর্বিড' সাহিত্যসৃষ্টির হাঁফ-ধরানো কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে তাও অন্তর্হিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়নে ভুগে এবং ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি শেষের দিকে ভাষার উপর ন্যূনতম প্রভুত্বও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর কিছু-কিছু প্রবন্ধ-জাতীয় রচনায় তিনি এমন এলোমেলো ভাষা ব্যবহার করেছেন যে, একটি অভ্যস্ত নিপুণ লেখনীর এই দুর্গতি দেখে মনে বিস্ময়ের উদয় হয়েছে। কিন্তু যিনিই মানিকের সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর মানসিক কেন্দ্রবিচ্যুতির কিছু-কিছু খবর রাখেন, তাঁর নিকট এই দুর্গতি ক্ষোভের কারণ হলেও বিস্ময়ের কারণ হবে না। অতিরিক্ত খুঁটিনাটি-সচেতন সন্দেহাকুল মনোভঙ্গীর এই পরিণামই স্বাভাবিক। পরিণামটিকে আরও বেশী ত্বরান্বিত করেছিল লেখকের নিঃসঙ্কোচ দেহবাদ ও কট্টর বাস্তববিলাস।

মানিক-সাহিত্যের আত্যন্তিক মনোবিশ্লেষণ-প্রবণতার আর একটি অবাঞ্ছনীয় পরিণাম হয়েছে এই যে, যে সকল মূল্যবোধকে আমরা যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা করে এসেছি, চিরন্তন ভারতীয় চেতনায় যে সকল মূল্যমান অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত জ্ঞানে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেছে, মানিকবাবু তাঁর খুঁটিনাটি-পরায়ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি ফেলে তাদের অনেকগুলিরই মূল্যবত্তা ও সার্থকতায় সন্দেহ রোপণ করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ধারণা-বিশ্বাসগুলিকে ব্যঙ্গ করতে পারলে যেন আর তিনি কিছু চাইতেন না।

শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করতে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবের উল্লাস ছিল। দয়া তাঁর নিকট কিছু নয়, কতকগুলি রসনিঃসারী স্নায়ুর ক্রিয়ার পরিণামফল মাত্র ; প্রেম বয়ঃসন্ধিকালের ফাঁপা মনোবিলাস ('দিবারাত্রির কাব্যে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ; সাধারণের ধর্মবিশ্বাস একটা অভ্যাসপুষ্ট গতানুগতিক সংস্কার বই কিছু নয় ('অহিংসা') ইত্যাদি। কোথায় মানিকবাবুর গণতান্ত্রিক চেতনা মানবীয় সভ্যতায় যা-কিছু সুন্দর ও মহৎ তাকে তুলে ধরবে, তা নয়, শ্রেণী-সংগ্রামতত্ত্বের উগ্র জিগির তুলে তিনি সেই সব সদ্‌বৃত্তিগুলিকেই আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মানিক-সাহিত্যের এই স্বতোবিরোধ—ঘোষিত আদর্শ ও কার্যপদ্ধতিতে অসামঞ্জস্য—সেই সাহিত্যের অনেকখানি মূল্যাপকর্ষ ঘটিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে সত্যই মহান্ ও গরীয়ান্ শিল্পী, সেখানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি এই অর্থে বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম রিয়ালিস্ট শিল্পী যে, সমসাময়িক কালের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের ট্র্যাজিডি এত নির্মম সত্যনিষ্ঠা ও শিল্পকুশলতার সঙ্গে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা সমাজের ক্ষয় ক্ষতি মনুষ্যত্বের অপচয় হতাশা ও গভীর বিষাদ তাঁর লেখনীতে মর্মান্তিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। তাঁর "প্রাগৈতিহাসিক", "ফেরিওলা", "বউ" পর্যায়ের গল্প, "লজ্জা" প্রভৃতি রচনা লেখকের অসাধারণ বাস্তবমুখী দৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। শেষের দিকের রচনায় অত্যাচারী ও শোষক সমাজের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম-চেতনার রূপক একাধিক গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে, এই-জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে "ছোট-বকুলপুরের যাত্রী" একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা।

কিন্তু এহ বাহ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিকারের মহত্ত্ব তাঁর স্বভাবসুলভ চিন্তাশীলতায়, প্রজ্ঞায়, দার্শনিকতায়। তাঁর ওই সহজাত দার্শনিকতার সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছিল। এই দার্শনিকতা একান্ত আক্ষরিক অর্থেই সহজাত ছিল। পুঁথি-কেতাব থেকে দার্শনিকতার শিক্ষা

তিনি গ্রহণ করেন নি, ভারতের সনাতন দার্শনিক ধ্যান-ধারণাগুলির প্রতিও যে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা বলা চলে না, তিনি দার্শনিক ছিলেন তাঁর স্বভাবের গভীর তাগিদের বশে, এ ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাবের প্ররোচনা ছিল সামান্য। 'পদ্মা নদীর মাঝি,' 'পুতুলনাচের ইতিকথা,' 'ইতিকথার পরের কথা,' 'দর্পণ' প্রভৃতি উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, এই সকল গ্রন্থের লেখক পল্লীজীবনের শুধু বহিরঙ্গের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না, তার গহন-গূঢ় অন্তর্জীবনেরও সংবাদ রাখতেন। 'অহিংসা' মর্বিড দেহবিলাসী বই হলেও তাতেও এই অন্তঃসঞ্চরণশীলতার ছাপ আছে। লেখকের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা এ ব্যাপারে তাঁর সহায় হয়েছিল। পল্লী-কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্ন-সমস্যার আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাদের মুখের কথায় এমন সব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংলাপ মাঝে মাঝে ঝিলকিয়ে উঠেছে, যা একান্ত মনোসন্ধানী প্রাজ্ঞ লেখকের লেখনীমুখেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। আমাদের ভারতবর্ষের পল্লীর মানুষের জীবনস্রোত চলে দুই ধারায়। সমান্তরাল তাদের গতি। এক ধারা হল প্রাত্যহিক জীবনের শতবিধ খুঁটিনাটির মধ্যে জীবিকানির্বাহের জন্য বেঁচে থাকা, আর এক ধারা হল এই জীবন-সংগ্রামেরই পাশে পাশে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অগোচরে চিন্তাকল্পনাময় একটি সূক্ষ্ম জীবন যাপন করা। পল্লী-কৃষকের জীবনে এই দুই ধারায় কখনও সংঘাত হয় না। পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাসের অতি সাধারণ পাত্র-পাত্রীর মুখেও লেখক প্রায়শঃ এমন সব গূঢ় অর্থব্যঞ্জক ভাবগাঢ় কথা বসিয়েছেন, যা সাধারণ প্রতীতিতে একমাত্র প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মুখেই উচ্চারিত হওয়া সম্ভব। স্বকীয় প্রতিভার লক্ষণচিহ্নমণ্ডিত দার্শনিক উক্তিতে লেখকের পাত্রপাত্রীসমূহের কথা ভরপূর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীজীবনের বাহ্য এবং গূঢ় এই দুই জগতের বার্তাই জানতেন। বাইরের জগৎ অপেক্ষা মনের জগতে ঘোরাফেরা করাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দতা ছিল বেশী। তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের লেখাতেও সহজ এই প্রজ্ঞা যথেষ্ট মাত্রায় আছে, তবে তাঁদের মনন জটিলতা-কুটিলতা-সমাচ্ছন্ন নয়। কুটিল চিন্তায় প্রথম নামীয় লেখকদ্বয়ের বিশেষ কোন উৎসাহ নেই—

বিভূতিভূষণের তো একেবারেই নয়। কিন্তু দোষ হোক গুণ হোক এইটেই ছিল মানিক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী তিন প্রকৃষ্ট ঔপন্যাসিকের মধ্যে মানিকের মৌলিকতাই সবচেয়ে বেশী।

মানিকবাবু গত হয়েছেন। তাঁর জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে এ কালের লেখকদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তিনি শিখিয়েছেন, সাহিত্যে গভীর নিষ্ঠা থাকলে লেখক তাঁর সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের বিফলতা সত্ত্বেও সমাজের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিতে জানেন। মানিকবাবু সাহিত্যের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন বলেই তাঁর রচনায় এমন গভীরতা এসেছিল এবং পাঠকমনের উপর তাঁর প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল। এমন কি ব্যবসায়বুদ্ধিসার প্রকাশক-সম্প্রদায়ও তাঁর শক্তিমত্তা আর আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষা, শক্তির সঞ্চয় যতই অপরিমিত হোক তা কেন্দ্রচ্যুত হলে অচিরেই তা নিঃশেষিত হয়ে আসতে বাধ্য। শৃঙ্খলা সংযম নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শুধু নিছক সুনীতি-হিসাবেই অনুশীলনযোগ্য নয়, শিল্পের সৃষ্টি বিকাশ এবং স্থায়িত্বের জন্যও ওই গুণগুলি প্রয়োজন। এ সকল গুণের অনুশীলন মানিকবাবু করেন নি, নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্য

আজকাল সমালোচকদের ভাষায় 'জীবন-ঘনিষ্ঠতা' কথাটির খুবই প্রচলন দেখতে পাই। কিন্তু কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা কতটা তলিয়ে দেখেছি তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্য কি আমরা তাকেই বলব, যার মধ্যে নিছক জীবনের রূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত; ম্যাথু আর্নল্ড যাকে criticism of life বলেছেন সেই জীবনভাষ্যটাই কি জীবন-ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক? এ কার জীবন? শিল্পীর নিজের জীবন, না, তিনি যাদের কথা তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বলেন, তাদের জীবন? রচনার ভিতর জীবনের ছবি নিখুঁত আর নিপুণ ভাবে প্রতিফলিত হওয়াটাই কি জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্যের দাবি পরিপূরণের পক্ষে যথেষ্ট? না কি, যিনি রচনার স্রষ্টা, সাহিত্যের রচয়িতা, তাঁরও এই ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা আছে?

স্বভাবতঃই এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম বিকল্পটির দিকে অধিকাংশ মানুষ ঝুঁকবেন। সাহিত্যস্রষ্টার স্বকীয় ভূমিকাটির কথা তাঁদের কারও বোধ হয় এ ক্ষেত্রে মনেই পড়বে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, শিল্পীর স্বকীয় জীবন-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তাঁর রচিত সাহিত্যের জীবন-ঘনিষ্ঠতার প্রশ্ন উত্থাপন করাই একপ্রকার অসম্ভব। শিল্পী নিজ জীবনে যা দেখেন, অনুভব করেন, চিন্তা করেন, তারই নির্যাস তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। শিল্পীর পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতা, মননজাত ভাবনা-কল্পনা, ধ্যানজাত উপলব্ধি ও বোধি সুনির্বাচিত ও সুগঠিত শব্দের আশ্রয়ে বন্দী হয়ে তবেই তা সাহিত্যের রূপ লাভ করে। শিল্পীর ভাবনা ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদির জারকরস রচনার বকযন্ত্রে পরিস্রুত হতে হতে তবেই এক সময় তা নিটোল শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়। এ ব্যাপারে শিল্পীর স্বকীয় জীবন একটা মস্ত বড় স্থান জুড়ে রয়েছে। তাঁর নিজের দেখা জগৎটাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে সচরাচর বহির্জগৎ বলে প্রচার করেন। তিনি যে সকল চিত্র-চরিত্র অঙ্কন করেন তাদের সকলের কেন্দ্রমধ্যে তিনি স্বয়ং

উপস্থিত। তাঁর আঁকা প্রতিটি চরিত্রের মুখাবয়বের মধ্যে তাঁর নিজের মুখের
আদল খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, শিল্পী স্বীয় মুখাকৃতির ধরনেই
তাঁর মানুষগুলির মুখ আঁকেন। ভাল-মানুষের মধ্যেও তিনি উপস্থিত,
আবার মন্দ-মানুষের মধ্যেও তিনি উপস্থিত। তাঁর শুভাশুভমিশ্রিত দ্বৈত
ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। শুধু তাই নয়, তিনি এই
চরিত্রগুলিকে কোন্ কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে কোন্ পরিণামের দিকে নিয়ে
যাবেন, সেখানেও তাঁর নিজের অভিপ্রায়টাই কাজ করে। তিনি একটা
বিশেষ চরিত্রকে বিশেষ রূপে রূপান্তরিত করতে চান বলেই সে তা হয়;
তিনিই সকল কাজের কাজী; নিরাপদ-নেপথ্যে অবস্থিত তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে
চরিত্রগুলি ওঠ্‌বোস করে, কাজ করে, কথা বলে। এক কথায় শিল্পীই শিল্প-
রাজ্যের সব-কিছুর অধীশ্বর, অবিসম্বাদী ভাগ্যবিধাতা।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হবে যে, শিল্পীরই জীবনের রঙে তাঁর
সাহিত্য আগাগোড়া অনুরঞ্জিত। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাঁরই জীবনভাষ্য ছাড়া
কিছু নয়। সাহিত্যে বিভিন্ন নামের আবরণে ও উপলক্ষে তিনি নিজেকে
চিত্রিত করেন বই নয়। তিনি কী পরিমাণ জীবন-ঘনিষ্ঠ তারই মধ্য
দিয়ে তাঁর সাহিত্যের জীবন-ঘনিষ্ঠতার পরিমাপ পাওয়া যায়। যে শিল্পী
ব্যক্তিজীবনে অব্যাহতিবাদের পরিপোষক, প্রতিক্রিয়াশীলতার তন্ত্রধারক,
তাঁর সাহিত্য জীবনবাদী তথা প্রগতিশীল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।
পক্ষান্তরে, যিনি জীবনকে খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করেছেন, জীবনের বিচিত্র
অভিব্যক্তি, ভঙ্গিমা আর স্তরের মধ্য দিয়ে যাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে,
কিতাবী বুলির সাহায্যে নয়, যিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের
সত্যমিথ্যা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, তাঁর সাহিত্য জীবন্ত সাহিত্য না হয়েই
পারে না। সত্যকার জীবন-সমালোচক সৃষ্টিমর্মী সাহিত্যিকের নিকট একমাত্র
কতিপয় মৌলিক মূল্যবোধ ছাড়া কোন মূল্যই স্বতঃসিদ্ধ নয়। শাস্ত্রবাক্যের
হাতে-ধরা হয়ে চলা কিংবা অথরিটি-নামে-কথিত পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির
চরণামৃত পান করা শিল্পীর কাজ নয়। তিনি নিজ জীবনে যা উপলব্ধি

করেন নি, হাজার অথরিটির দোহাই পাড়লেও তা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। অপর পক্ষে, স্বীয় গভীর উপলব্ধিপ্রসূত ধারণা-বিশ্বাস বাজার-চলতি দশের মতের অনুরূপ হোক প্রতিকূল হোক, তিনি শুধু তাঁর শিল্পের ভিতর নিজের সত্যস্বরূপকে অনুসরণ করতেই কৃতসঙ্কল্প। আসলে প্রতিটি মহৎ সাহিত্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী, জীবন-ঘনিষ্ঠ। 'জীবন-ঘনিষ্ঠ' এই অর্থে নয় যে, সংশ্লিষ্ট শিল্পী জীবনের মেলাই ঘটনা আর মেলাই মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন; 'জীবন-ঘনিষ্ঠ' এই অর্থে যে, যা-ই কিছু তিনি দেখেছেন, করেছেন, ভেবেছেন, তারই মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। তিনি যা কিছু দেখেছেন, করেছেন বা ভেবেছেন তার মধ্যে নিজে স্বয়ং প্রবলভাবে বেঁচেছেন বলেই তাঁর সাহিত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, জীবনে জীবন (নিজ জীবন) যোগ করতে পারার জন্যই তাঁর সাহিত্য যথার্থ জীবন-ঘনিষ্ঠ-পদবাচ্য হয়েছে।

এইখানেই সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আমাদের মানসিক আলস্যবশতঃ আর গতানুগতিক ধারণার প্রাবল্যহেতু সব রকমের রচনাকেই সাহিত্য বলার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে—এই আত্মপ্রসাদের কবল থেকে যত শীঘ্র মুক্ত হতে পারা যায় ততই মঙ্গল। মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যে জিনিস ধরে দিয়েছেন তা-ও সাহিত্য, আবার অধ্যাপক-লিখিয়েরা ছাত্রদের মুখ চেয়ে আর বই-কাটতির দিকে চোখ রেখে যে টীকা-জাতীয় রচনা পরিবেশন করেন তা-ও সাহিত্য। যেন সাহিত্য সহজলভ্য বৃক্ষের ফল, চাইলেই টুপ করে হাতের তেলোয় এসে পড়বে। সাহিত্যের জন্য ব্যক্তি-জীবনে সাধনার প্রয়োজন নেই, অভিজ্ঞতা আহরণের প্রয়োজন নেই, ধ্যান-অনুধ্যান-মননের প্রয়োজন নেই; শুধু ভাল ছেলের মত ধাপের পর ধাপ পরীক্ষা পাস করে কোন গতিকে একটা তথাকথিত অধ্যাপকের তক্তে চড়ে বসতে পারলেই হল। তার উপর কষ্টেসৃষ্টে একটা ডক্টরেট-ডিগ্রী যদি উপাধি-তালিকায় জুড়ে দেওয়া যায় তা হলে তো আর কথাই নেই, সাহিত্যের শীর্ষদেশে আরোহণের ছাড়পত্র অচিরাৎ করতলগত হয়ে পড়ল। তারপর

আর বাধা নেই, সাহিত্যসৃষ্টির নামে অক্ষম আর পঙ্গু ভাষায় টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্য-জাতীয় লেখায় অধীত বিদ্যা ওগরাতে পারলেই হল। প্রকাশকেরা তো এই ধরনের বই লুফে নেবার জন্য আগু বাড়িয়েই থাকেন, সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বাঁধানো রাজপথ দিয়ে বিজয়গৌরবে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়ায় আর কোন অন্তরায় থাকে না।

বাস্তবিক, সাহিত্যের সংজ্ঞাকে এত সস্তা করে তোলা হয়েছে বলেই সাহিত্যের আজ এই দুরবস্থা। সাহিত্য আর 'নোট' লেখা সমার্থক হতে চলেছে। বৈষয়িক সাফল্যের বিগ্রহমূলে গললগ্নীকৃতবাস যত সব কেজো লোক সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছে। প্রকৃত মৌলিকতার লক্ষণমণ্ডিত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যচর্চা করেন মাত্র গুটি কয়েক লোক, আর বাদবাকি সব লেখক হয় সাংবাদিকতা করেন, নয় অধ্যাপক-মার্কা সাহিত্যরচনায় ব্যাপৃত আছেন। অধ্যাপক-মার্কা সাহিত্যসৃষ্টিতে হাত পাকালে প্রকাশকদের আনুকূল্যে আর ছাত্র-সম্প্রদায়ের দৌলতে নাম এবং ধাম দুই-ই হয়; সুতরাং ওই এলাকাতেই লেখকদের ভিড় বেশী। বেশীর ভাগই আক্ষরিক অর্থে লিখনব্যবসায়ী, সাহিত্যের আশ্রয়ে তাঁদের স্থূল আরাম-বিলাসের স্বাদ পরিতৃপ্তির উপায় খুঁজছেন কিংবা আখের গুছোবার তালে আছেন। কিন্তু এই সহজ কথাটা এঁদের কে বোঝাবে যে, অধ্যাপক হলেই কেউ সাহিত্যিক হন না? সাহিত্যশিল্পীর শিক্ষা-দীক্ষা অভিজ্ঞতা মূলতঃ জীবনের ভাণ্ডার থেকে আহৃত হয়, উপাধির উৎস থেকে নয়। অবশ্য এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, অধ্যাপকদের মধ্যে জাত-লিখিয়ে কেউ নেই। অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের অধ্যাপকতা আর সাহিত্য-ক্ষমতা এক অনুশীলনের পরিণামফল নয়। দুইয়ের ক্ষেত্র আলাদা। অধ্যাপক হলেই কেউ লেখক হন না, তবে লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ বৃত্তিতে অধ্যাপক থাকতে পারেন। এখানে নিয়মটি একমুখী, নিয়মের বিপরীতটি (converse) সত্য নয়।

'জীবন-ঘনিষ্ঠ' অভিধার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে বোঝা দরকার যে, সমসাময়িক জীবনধারার সঙ্গে যে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ এবং

নিবিড় সংযোগ নেই, যে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে জীবন্ত যোগে যুক্ত নন, মনোজীবনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অন্তর্সংঘাতের সম্মুখীন যাঁকে হতে হয় নি বা যাঁর সে প্রবণতা নেই, তিনি যত বড় নামী আর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হোন না কেন, সাহিত্যের এলাকায় অন্ততঃ তাঁর প্রবেশাধিকার গ্রাহ্য নয়। তিনি গালভরা উপাধিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কেষ্টবিষ্টু হতে পারেন, সরকারের বিচক্ষণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে পারেন, এমন-কি আমাদের সকল-প্রতিবাদ-আপাতস্তব্ধকারী আই-সি-এস হতেও তাঁকে কেউ আটকাচ্ছে না। কিন্তু কিছুই কিছু নয়, যদি না সাহিত্যসেবার মূল ধর্ম ও প্রতিভা তাঁর অধিগত হয়ে থাকে। মুশকিল হয়েছে এই যে, আমরা বয়োবৃদ্ধি কিংবা জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার নজীরটাকেই একমাত্র অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতার একমাত্র মাপকাঠি মনে করি। যে ব্যক্তি জীবনে সাংসারিক সাফল্য লাভ করেছেন, কেজো বা 'বিচক্ষণ' লোক বলে যাঁর খ্যাতি হয়েছে, তাঁর অভিজ্ঞতা-সম্পদের আমরা শতমুখে প্রশংসা করি। কিন্তু সংসারের স্থূল অভিজ্ঞতা আর সাহিত্যের অভিজ্ঞতা এক বস্তু নয়। জীবন-ঘনিষ্ঠতা বলতে গতানুগতিক দশজনার মত জীবনের বাঁধা পথ মাড়ানো বোঝায় না, বাজার-চলতি জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেই কেউ সেই নজীরে জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন না; জীবন-ঘনিষ্ঠ হতে হলে জীবনের প্রতিটি দৃষ্ট বস্তু ঘটনা বা মানুষকে স্বীয় ব্যক্তিত্বের নিকষে নতুন করে যাচাই করে দেখা চাই, স্বীয় অনুভূতির আলোয় প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল্য কষা চাই। মনোজীবনে যিনি প্রবলভাবে বাঁচেন না, বাস্তবের সঙ্গে যিনি গভীর অনুভবের যোগে যুক্ত নন, তিনি সাংসারিক অভিজ্ঞতায় সম্যক্ ধনী হলেও সাহিত্যের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ সঞ্চয় করতে পারেন নি, সে কথা জোর করে বলা যায়।

অধ্যাপকের দৃষ্টান্তই ধরুন। যাঁকে আমরা সাংসারিক মাপকাঠিতে 'ভাল ছেলে' বলি তিনি হয়তো তা-ই। সহজাত মেধা আর প্রভূত স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে একটির পর একটি পরীক্ষার বেড়া সাফল্যের সঙ্গে টপকে তিনি হয়তো একদিন যথাস্থানে সম্মানের সহিত অধিষ্ঠিত হয়ে বসলেন।

তারপর সমানে চলল তাঁর ছাত্র-পড়ানো আর পরের মৌলিক রচনাকে আশ্রয় করে টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্য-তৈরির কাজ। অন্তহীন চক্রে চক্রায়িত, একঘেয়ে পৌনঃপুনিকতার বিবরে স্বেচ্ছাবন্দী এই নীরন্ধ্র পরবিদ্যাশ্রয়িতার মধ্যে সাহিত্যের অভিজ্ঞতাটা এল কোন্ পথ দিয়ে? অধ্যাপক ক্লাসে সাহিত্য পড়ান বা তার উপর 'নোট' রচনা করেন বলেই কি সেই সুবাদে তিনি সাহিত্যশিল্পী হয়ে গেলেন? স্নাতকোত্তর স্তরে পরীক্ষা-পাসের দ্যোতক তাঁর নামের পিছনে একাধিক লেজুড় থাকতে পারে, কিন্তু তিনি জীবনের কটা পরীক্ষা পাস করেছেন? মনোজীবনে তিনি স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর কী পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর চিন্তাভাবনার ভর সইয়েছেন? একমাত্র কতকগুলি অপরিণতমনা ছাত্রছাত্রীর সঙ্গেই যা তাঁর পরিচয়, তাও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মৌখিক, এ ছাড়া তিনি অন্য মানুষের সংস্পর্শে এলেনই বা কোন্ সূত্রে? তবে তিনি জীবনকে জানলেন চিনলেন কী প্রকারে? 'নোট' লেখার বিদ্যা আর সাহিত্যরচনার বিদ্যা কি এক? এইজন্যই দেখতে পাওয়া যায়, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ একজনই হন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যকৃতি নিয়ে পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই ভরিয়ে তোলার মত অধ্যাপক-লিখিয়ের অভাব হয় না। শেক্সপীয়র কবে গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর নাটকের ভাষা-ভাষ্য নিয়ে অধ্যাপক-সমালোচকদের বিবাদ-বিতর্কের আজও অবসান হল না। অধ্যাপক-লিখিয়েরা হলেন শেক্সপীয়র-ঘনিষ্ঠ আর শেক্সপীয়র ছিলেন জীবন-ঘনিষ্ঠ—এইখানেই মৌলিক পার্থক্য।

আসলে মুশকিল হয়েছে এই যে, অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেমন সমাজ-স্বীকৃত স্কুল-কলেজ আছে, সাহিত্যশিক্ষার জন্য সেরূপ কোন বিদ্যায়তন নেই। ফলে এখানে কে বড় আর কে মাঝারি তা নিরূপণ করা সহজ হয় না। এই নিদারুণ অসুবিধার জন্য অনেক সময় এমনও হয় যে, সাহিত্যের বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক ক্লাসের দেউড়িও পেরোতে পারেন না এমন ব্যক্তি শুধু ধনকৌলীন্য, কৌলিক আভিজাত্য আর সামাজিক পদমর্যাদার জোরে উঁচু ক্লাসের মাথায় চড়ে বসে থাকেন। কেন না, যে মানদণ্ড দিয়ে গুণাগুণ নিরূপিত হবে সে

মানদণ্ডটি বড় সহজলভ্য নয়। একমাত্র রসিকসুজনেরই তা করধৃত থাকে, অন্যেরা তার নাগাল পায় না। অবশ্য সাহিত্যশিক্ষার স্থূল নীতিগতভাবে বাঞ্ছনীয় হলেও কার্যতঃ সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রকৃতির মধ্যেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার বাধা লুকিয়ে আছে। সাহিত্যের লেবরেটরি স্কুলে-কলেজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ওটি যার যার মনের ভিতর থাকে। যিনি যেভাবে জীবনকে দেখেছেন তাঁর সাহিত্যও সেইভাবে এবং সেই আকারে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক কিংবা এই-জাতীয় গতানুগতিক বৃত্তিধারী মানুষের একটা অসুবিধা এই যে, তাঁদের জীবনে প্রায়শ কোন বৈচিত্র্য থাকে না। বাঁধাধরা জীবিকার সমলয়ে উত্থিত-পতিত তাঁদের জীবন মূলতঃ পুঁথি-কেতাবকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হতে থাকে। ঘটনা ও মনন-গত যে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা মানুষের সত্তাকে নাড়া দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটায়, তার সৃজনী-ক্ষমতাকে উদ্রিক্ত ও বিকশিত করে তোলে, সেই অস্তিত্বমন্থনকারী প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোড়ন-জাগানো অভিজ্ঞতার শরিক হওয়ার সুযোগ খুব কমই তাঁদের ভাগ্যে ঘটে। তাঁদের ধরা-মাপা কাজ, ধরা-মাপা পথেই সে কাজের ধারা অগ্রসর হয়। অবশ্য বহু-বিচিত্র বিষয়ে অধ্যয়নের ফলে এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ব্যাপকতার ফলে তাঁদের মনের প্রসার যথেষ্টই ঘটে, কিন্তু মনের প্রসার এক কথা আর সৃজনক্ষমতা অন্য কথা। যে মন শান্ত, নিস্তরঙ্গ, বিক্ষোভসংক্ষোভবিহীন, সে মন সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয় না। তেমন আয়েশী মন সাংস্কৃতিক চেকনাইয়ের ছত্রছায়াতলে অধিষ্ঠিত থেকে প্রভূত অধ্যয়নের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা বড় জোর ভাষ্য-সংরচনক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়, মৌলিক কিছু লেখবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায় না। এমন কি মৌলিক সমালোচনাও লেখা যায় না। পরের লেখার উপর দাগা বুলোতে বুলোতে নিজের ক্ষমতা যদি বা কিছু থাকে তাতে মরচে ধরে যায়। সৎ পরিবেশ, সজ্জন সঙ্গ, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির সঙ্গে নিবিড় সাহচর্য ইত্যাদি সুবিধা অধ্যাপকবর্গীয় লেখকদের সহজায়ত্ত, কিন্তু এতে মন মার্জিত পরিশীলিত উৎকর্ষপ্রাপ্ত হলেও তা বড় একটা মৌলিক রচনাশক্তির ধার ঘেঁষে

না। সাক্ষাৎ বাস্তবের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারা যে মন কর্ষিত হয় নি সে মন প্রচুর অধীত বিদ্যা সত্ত্বেও এক-ধরনের বালসুলভ সারল্যের স্তরে থেকে যায়, যা অধিকাংশ ছাত্র-চরানো অধ্যাপকের স্বভাব-নিয়তি বলা যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, বৈদগ্ধ্য আর উচ্চশিক্ষা সৃষ্টিক্ষমতার সমধর্মী নয়। যদিও এই দুয়ের মধ্যে আকস্মিক যোগাযোগের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নেই। বৈদগ্ধ্য আর উচ্চশিক্ষার কল্যাণে বড় জোর সাহিত্যের প্রকাশরীতি, আঙ্গিক ও রচনাশৈলী, ভাষাজ্ঞান ইত্যাদি বহিরঙ্গের কৌশল অধিগত হয়, কিন্তু সৃষ্টির আবেগ মোটেই ওই সূত্র থেকে আসে না। তার জন্য বারংবার জীবনের গভীরে অবগাহনের প্রয়োজন হয়।

অন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নেই, শুদ্ধমাত্র মাইকেলের উদাহরণ থেকেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। মাইকেলের অনুপম কাব্যসৃষ্টির মূলে তাঁর সুনিবিড় ক্লাসিক কাব্যসাহিত্য-প্রীতি যত না কাজ করেছে তার চাইতে বহু—বহুগুণে বেশী কাজ করেছে কবির নাটকীয় জীবন-পরিবেশ। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির মাধ্যমে তিনি কাব্যের প্রকরণের জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু ওই নিষ্প্রাণ কিতাবী সূত্র থেকে তিনি সৃজনের আকূতি কেমন করে সংগ্রহ করবেন? তার জন্য বারে বারেই তাঁকে তাঁর জীবনের দুয়ারে ফিরে যেতে হয়েছে। সে জীবন গতানুগতিক জীবন নয়; স্বাতন্ত্র্যচেতনায় ভরপূর, অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত অসাধারণ বলিষ্ঠ এক জীবন। সর্বপ্রকার প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহে এই জীবনের অগ্রাভিযানের সূত্রপাত; প্রভূততম শক্তির প্রচুরতম ক্ষয়ের অনুশোচনায় এই জীবনের পরিসমাপ্তি। স্বল্পকালীন আয়ুযুক্ত এই অত্যাশ্চর্য জীবন যেমন একদা হঠাৎ দপ্ করে জলে উঠেছিল তেমনই নাটকীয় উৎক্ষেপের সঙ্গেই একদিন ফুৎকারে নিবে গেল। কিন্তু সেই প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা সেইখানেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, তার ভাস্বরবিভায় মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্যকে চিরকালের জন্য প্রদীপ্ত করে রেখে গেছে। মধুসূদন তিল তিল করে জীবনকে ক্ষয় করে তবে কাব্যের

তিলোত্তমাকে গড়ে তুলেছিলেন। নিজ জীবনে দুঃখ ও লাঞ্ছনার যে অপরিমেয় গরল তিনি পান করেছিলেন তাকেই তিনি অসামান্য স্বাদু সুধায় রূপান্তরিত করে সেই অমৃতভাণ্ড গৌড়জনের হস্তে সমর্পণ করে গেলেন। কবির ব্যক্তি-জীবন তাঁর কাব্যহোমানলে আহুতিপ্রদত্ত পূত সমিধ্, এই আহুতি যে ব্যর্থ হয় নি তার ইতিহাস সকলেই জানেন। শিল্পীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কত বড় মূল্যবান উপকরণ মধুসূদনের জীবন তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এ থেকে মনে হতে পারে, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি সংরচনের বেলায় আমি উচ্চশিক্ষার বা অধ্যয়নের গুরুত্ব স্বীকার করছি না। মোটেই তা নয়। গুরুত্ব যথেষ্টই আছে, তবে সে প্রধানতঃ মনের প্রকর্ষ সাধনের জন্য, রুচির পরিমার্জনার জন্য। শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা যে বৈষয়িক কর্মের জ্ঞান আয়ত্ত হয় তার মূল্যও কম নয়। কিন্তু সৃজনক্ষমতা? ওটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। যে মন অন্তর্নিবিষ্ট নয়, বাস্তব-সচেতন নয়, বিচারপ্রবণ নয়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসম্পন্ন নয়, সহানুভূতিশীল নয়, মানবপ্রেমী নয়, তার অধিকারী ব্যক্তিটি যতই উত্তুঙ্গ বিদ্যার অধীশ্বর হোন না কেন, শিল্পজগৎ থেকে তিনি সহস্রযোজন দূরে আছেন। ডক্টরেট-ডিগ্রীধারীরা তাঁদের নিষ্ফল গবেষণার প্রাকার খাড়া করে শিক্ষাব্যবসায়ীদের মুগ্ধ করতে পারেন, ডক্টরেট-ডিগ্রীর থাবড়া মেরে ছাত্রদের কাত করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যজগতে তাঁদের আঁচড়টি কাটবার সম্ভাবনাও নেই। শিল্প সাহিত্য এত সস্তার জিনিস নয় যে, যেমন-তেমন ভাবে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই তা আত্মগত হয়ে যাবে। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার কৃতিত্বকে সৃজনধর্মিতা মনে করার মত ভুল আর নেই। তথাকথিত সাংস্কৃতিক চিক্কণতার সঙ্গে সৃজনের উদ্দামতা ও প্রাণবন্ততার প্রায়ই সামঞ্জস্য হয় না।

মধুসূদনের দৃষ্টান্ত উৎকলন করায় কারও কারও এই ধারণা হতে পারে যে, প্রকারান্তরে শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে নিয়মশৃঙ্খলা-মানা, সংযমের শাসন স্বীকার-না-করা জীবনযাত্রার রীতিটিই আমি আদর্শরূপে প্রচার করতে চাইছি। আদৌ তা নয়। সংযম ও শৃঙ্খলার অপহ্নবকারী প্রতিটি ব্যবস্থা আর কার্যই

নিয়মপরায়ণ মনের নিকট পীড়াদায়ক ঠেকে, আমাদের নিকটও তাই। উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার আদর্শ সুস্থও নয় কল্যাণকরও নয়। তবে উৎকেন্দ্রিক, অব্যবস্থিত জীবনাদর্শ অপছন্দ বলে বৈষয়িকস্বার্থবুদ্ধিসার কেজো লোকের টাকা-আনা-পাইয়ের জীবন পছন্দ হবে এমনও কোন কথা নেই। ওই সব হিসাব-কিতাবের দিনযাত্রা পেশাদার 'নোট-মেকার'দের জন্য তোলা থাক্, প্রকৃত সাহিত্যকর্মীরা তা থেকে দূরে থাকুন।

শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর শক্তি সংগ্রহ আর শক্তিক্ষয় নিরোধের জন্য শৃঙ্খলা-সংযমের অনুবর্তী হবেন তাতে সন্দেহ কি, তাই বলে তাঁর পক্ষে মধ্যবিত্ত মানসিকতাযুক্ত একটি নিষ্প্রাণ পাঁশুটে সংসারী কেজো লোকের জীবনযাপন করা আত্মহত্যার তুল্য বিচ্যুতি। জীবন-ঘনিষ্ঠতার দাবি পূরণ করতে হলে পাপপুণ্যের আলো-আঁধারিযুক্ত জীবনের অতলতলে ডুব দিতে হয়, তেমন মানুষের পক্ষে নিক্রিয় কেজো গৃহস্থের জীবন শোভা পায় না। বইয়ের ফাঁপা জনপ্রিয়তা আর কাটতির দিকে চোখ রেখে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের সাহিত্য কোন কালেই মহত্ত্বে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সাহিত্যের বিশেষ পরিবেশ মনে রেখে বলছি, এই-জাতীয় লেখকের জীবনবিমুখ সস্তা রোমান্টিকতাশ্রয়ী লেখকের পরিণতি বরণ করাই স্বাভাবিক এবং সেইটেই তাঁদের উচিত নিয়তি। যাঁরা সাহিত্যিক সাফল্যের জন্য 'ন্যূনতম প্রতিরোধ' আর কিছুকেই এবং কাউকেই না ঘাঁটানোর নীতি গ্রহণ করেন তাঁদের সাহিত্য আপাত-সুখকর হলেও চূড়ান্ত বিচারে অগ্রাহ্য।

শিল্পীর নিজ জীবন তাঁর শিল্পকর্মের পক্ষে একটা মস্ত বড় উপাদান। কে কী ভাবে সেই জীবনকে পরিকল্পনা ও বিন্যাস করে তার উপর তাঁর শিল্পকর্মের গুণাগুণ অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে। স্বল্পে তুষ্ট নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয়ের জীবন যাপন করে জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্যরচনার আশা দুরাশা মাত্র। এ বিষয়ে টমাস মান যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। টমাস মান শিল্পীর জীবন ও তাঁর শিল্পের মধ্যে সম্পর্কের প্রসঙ্গ নিয়ে বহু চিন্তা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর অধিকাংশ গল্পোপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় এইটেই। তিনি

বলেছেন, "...Good work only comes out under pressure of a bad life ; that he who lives does not work ; that one must die to life in order to be utterly a creator." ("Tonio Kroger") অর্থাৎ অগতানুগতিক জীবন থেকেই শুধু মহৎ কাজের জন্ম হওয়া সম্ভব। পুরাপুরি একজন স্রষ্টা হতে গেলে সৃষ্টির বেদীমূলে জীবন বলিপ্রদত্ত হওয়া দরকার। স্থূল সুখভোগের কামনা যাঁর মধ্যে রয়েছে, তাঁর আর যাই সাজুক স্রষ্টা হওয়া সাজে না। জীবনপ্রেমিক হতে গিয়ে তিনি শিল্পপ্রেমকে হারান। শিল্পী যেন তান্ত্রিক সাধক, অঞ্জলি ভরে মৃত্যুগরল পান করতে করতেই তিনি জীবনায়নের মন্ত্র উচ্চারণ করেন। নিজ জীবনকে লৌকিক সুখভোগের শতবিধ উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে তবেই তিনি প্রকৃত শিল্পামৃতের সন্ধান পান। বেশীর ভাগ মানুষই আমরা কাব্যের কিংবা অন্যবিধ সাহিত্যকর্মের আক্ষরিক অর্থমাত্র গ্রহণ করি। আমাদের আলস্যপরায়ণ, জড়তাগ্রস্ত মন শব্দার্থের স্তর অতিক্রম করে গূঢ়ার্থের স্তরে পৌঁছবার কৌশল জানে না। ফলে শিল্পরসও প্রায়শ আমাদের অনধিগম্য থেকে যায়। কিন্তু যে মন আঘাতে-সংঘাতে আর আনন্দ-বেদনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে, বহু মানুষের জীবনের গভীরে যে মন কল্পনার দ্বারা প্রবেশের চেষ্টা করেছে এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাদের অভিপ্রায় আর আচরণকে যাচাই করেছে, সে স্বতঃই মহৎ শিল্পকর্মের অন্তর্শায়ী অর্থ গ্রহণ করে অপূর্ব শিল্পোপভোগের রসে নিমজ্জিত হয়। শুধু তাই নয়, নিজেও সে এতদ্বারা অনুরূপ মহৎ শিল্পকর্মসৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করে। জীবনের পরিকল্পনাটাই এমন যে এক দিকে তার বঞ্চনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলে অন্য দিক ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। জীবন-ঘনিষ্ঠ শিল্পী সংসার-জীবনের খাতে অনেক কিছু হারান, কিন্তু ওই বঞ্চনার মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্পজীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এক দিকের অলাভ ভগবান অন্য দিকের লাভে সুদে-আসলে পুষিয়ে দেন।

নোবেল প্রাইজ ও বাংলা সাহিত্য

আমাদের মাতৃভাষার অবস্থা নিয়ে আজ আলোচনা করব। তথ্যের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য একটি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য। ভারতরাষ্ট্রের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ বাংলা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এই ভাষার প্রচলন। যদিও সবশুদ্ধ প্রায় সাত কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বস্বীকৃত, তৎসত্ত্বে এ অপ্রীতিকর তথ্য মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা অদ্যাবধি আঞ্চলিকতার মধ্যেই কম-বেশী সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ কথার অন্যতর প্রমাণ, বাংলা ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় নি, যদিও এ ক্ষেত্রে হিন্দীর তুলনায় তার দাবি কোন অংশে ন্যূনতর ছিল না। হিন্দীর সপক্ষে যদি হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার নজির উত্থাপন করা যায়, তা হলে বাংলা ভাষার সপক্ষে তার সাহিত্যগত উৎকর্ষকে পালটা জোরালো নজিররূপে খাড়া করা চলে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট বাংলা ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিশেষ কোন স্বীকৃতি মেলে নি। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী এবং নয়া-দিল্লীর সাহিত্য-আকাদেমির কর্তাদের বিচারে বাংলা ভারতের চোদ্দটি মুখ্য ভাষার অন্যতম ভাষা। মাত্র এইটুকু স্বীকৃতিতে বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, সে প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কারও মনে উদয় হয়েছে বলে আমরা জানি না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য বঙ্গভাষা-প্রসার-সমিতির প্রয়াসের অন্ত নেই। তাঁদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, তবে শুদ্ধমাত্র ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে তাঁদের উচিত বাংলা সাহিত্যের গুণগত স্বীকৃতির জন্য আরও বেশীমাত্রায় সচেষ্ট হওয়া। বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে বিশেষ উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না, যদি না সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার মর্যাদাও সম্প্রসারিত হয়। শেষোক্ত দিক দিয়ে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত চেষ্টা হয়েছে বলে মনে করি না।

ঘরেই যখন এই অবস্থা, তখন বাইরের কথা আর কী বলব! বাইরে বলতে এখানে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকে বোঝানো হচ্ছে। এ কথা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অগৌরবের ও দুঃখের সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যের স্থান আজও নিতান্ত নগণ্য। সেই কবে ১৯১৩ সনে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অধিকার করার পর বাংলা ভাষার উপর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি একবার নিবদ্ধ হয়েছিল, তারপর যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। নোবেল প্রাইজের তালিকায় বাংলা সাহিত্যের নাম ভুক্ত ও বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর ৪৩ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুবিস্তৃত সময়-সীমার মধ্যে দ্বিতীয় বার আর আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামধেয় এক অর্ধজ্ঞাত ভারতীয় তথা বাঙালীর নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্তিরূপ ঘটনায় বিশ্বসাহিত্যসরোবরের জল খানিকটা আলোড়িত হতে না হতেই সেই আলোড়ন থিতিয়ে আসে। তারপর দীর্ঘকাল একটানা বাংলা সাহিত্যের বিস্মরণ।

এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।—হয় বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বসাহিত্যের ধারক ও বাহকেরা শোচনীয়রূপে উদাসীন, নয়তো 'গীতাঞ্জলি'র পর বাংলায় আজ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি যা বাঙালীত্ব তথা ভারতীয়ত্বের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় বিভূষিত হতে পারে। স্পষ্টতঃই একটি সিদ্ধান্ত অপর সিদ্ধান্তের কর্তক। সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ সুনিশ্চিত ধারণায় উপনীত হবার আগে আমাদের সমস্ত বিষয়টি ধীরচিত্তে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আমার মনে হয় 'গীতাঞ্জলি'র অনুকূলে নোবেল পুরস্কার সমর্পিত হওয়ার অব্যবহিত পরে এ দেশে নোবেল পুরস্কার নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করা হয়েছিল। যেন কোন এশিয়াবাসীর পক্ষে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এক অলৌকিক সংঘটন, যেন আমাদের সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় স্বভাবতঃই দীন, যেন রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে প্রাপ্যের

অতিরিক্ত সম্মান জানানো হয়েছে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ যেন বাঙালীর দিগ্বিজয়লাভের সংবাদ ঘোষিত হল। এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির বোধ ও মত্ততা শুধু যে তৎকালীন জনমতের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে তা-ই নয়, স্বয়ং মহিমান্বিত পুরস্কারপ্রাপকের অন্তরকেও যে অজানিতে স্পর্শ করেছিল তার প্রমাণ আছে। এত বড় দিগ্বিজয় যখন একবার করা হয়েছে তখন কোন আচরণেই কোনরূপ মালিন্যের দাগ অর্শাবার নয়, এমনি এক চূড়ান্ত আত্মতৃপ্তির ভাব বোধ হয় তখন আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত ছিল।

নোবেল পুরস্কারের গৌরব ও মর্যাদা সম্পর্কে এই অনুপাত-অতিরিক্ত সম্ভ্রমের ভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিই করেছে আমরা বলব। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দ্বারা আমরা যে না-পাওয়া কিছু একটা পেয়েছি এই সংবাদ দেশের সীমা ভেদ করে ইউরোপেও প্রচারিত হয়ে থাকবে, ফলে দ্বিতীয় বারের জন্য বাঙালী লেখকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা চিরতরেই বোধ হয় রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের নিজেদের মধ্যেই যদি যথেষ্ট পরিমাণে আত্মপ্রত্যয় ও শ্রদ্ধার ভাব না থাকে, নিজেরাই যদি আমরা বাংলা সাহিত্যকে সঙ্কীর্ণ-পরিসর একটি বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি, তা হলে অপরে আগু বাড়িয়ে আমাদের সাহিত্যকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে আসবে এরূপ আশা করা মূঢ়তা।

আঞ্চলিকতায় বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব আর বিকাশ হলেও আঞ্চলিকতার অগৌরব বাংলা সাহিত্য দীর্ঘকাল পিছনে ফেলে এসেছে। বাংলা সাহিত্য তথ্যগতভাবে আঞ্চলিক সাহিত্য, কিন্তু সত্যগতভাবে এ ভাষার মর্যাদা আন্তর্জাতিক। আত্মশ্লাঘার অপরাধে অপরাধী না হয়ে বলা যায় যে, বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ তুলনীয়। ইংরেজী বা ফরাসীর সঙ্গে বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই সমান পংক্তি দাবি করতে পারে না, তবে কাছাকাছি সারিতেই যে তার স্থান—একমাত্র অন্ধ ইউরোপপ্রেমিক ছাড়া আর সকলেই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য।

আমাদের কথা হচ্ছে, শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে একাধিক লেখকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা ইউরোপের মানদণ্ডেই ইউরোপের ওই সেরা সাহিত্য-গৌরব নোবেল পুরস্কার লাভের যোগ্য ব্যক্তি। এমন ধারণা পোষণ করবার কোনই কারণ নেই যে, 'গীতাঞ্জলি'র লেখককে নোবেল পুরস্কার দান করে তাঁকে বাধিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সুইডিশ নোবেল পুরস্কার কমিটী অপেক্ষা অনেক—অনেক বড়। সুইডিশ কমিটী রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার অর্পণ করে প্রকারান্তরে নিজেদেরই সম্মানিত করেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্তির আকস্মিকতার চমকে এই বোধ সম্ভবতঃ স্বয়ং কবির মনে সাময়িক ভাবে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই আত্মবিস্মৃতিকে উপেক্ষা করা চলে যদি আমরা মনে রাখি যে, লেখকের ব্যক্তিত্ব মহিমময় হলেও তাঁর কীর্তি তদপেক্ষা অনেক বেশী মহিমময়। ব্যক্তি মুছে যায়, কীর্তি মোছে না। কীর্তি কারকনিরপেক্ষ এক মহতী জাতীয় সম্পদ। ব্যক্তিচরিত্রের মোহ আর দুর্বলতা নিতান্ত সাংসারিক ঘটনা, কীর্তি অবিনশ্বর। ব্যক্তিকে দিয়ে ব্যক্তি-প্রতিভার দান বিচার করতে গেলে প্রায়শ ভ্রান্তিকবলিত হবার আশঙ্কা থাকে।

আর ইউরোপীয় মানদণ্ডের কথাই যদি ধরা যায়, সে মানদণ্ড এমনই বা কি প্রাচ্যদেশীয় লেখকদের আয়ত্তের বহির্ভূত বস্তু? এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে, যাকে সাহিত্যের আধুনিক পর্ব বলা হয় সেই বিশেষ বিভাগে ইউরোপীয় সাহিত্য অনেকখানি পরিমাণে এগিয়ে আছে এবং এই দিক দিয়ে গোটা রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সুফল আত্মসাৎ করে সে সমৃদ্ধ হয়েছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ-জনিত প্রভাবের ফলেই উপজাত হয়েছে সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সাহিত্যের পুরাতন সংস্কার, ধ্যানধারণা আর ভাবাদর্শের বিচারের প্রশ্নে ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করবার কোনই হেতু নেই। বরং প্রকৃত তথ্য এই যে, এই ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য পাশ্চাত্ত্য দেশীয় ঐতিহ্যের

তুলনায় অনেক বেশী গরীয়ান্, অনেক বেশী মহৎ মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যে গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে ইউরোপে রেনেসাঁসের বিস্তার, সেই সংস্কৃতির জীবনপ্রীতির অংশটুকু বাদ দিলে তা নিঃসংশয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি অপেক্ষা খাট। এটি জাতীয় আত্মশ্লাঘার কথা নয়, ষোল-আনা হক কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে, গ্রীক সংস্কৃতি সর্বাংশেই ভারতীয় সংস্কৃতির অনুজ, অনুগত ও অধীন। গ্রীক জীবনযাত্রার ধারায় বাহুবলকে প্রাধান্য দেওয়া হত, সনাতন ভারতীয় চিন্তাধারায় মানসিক তথা আধ্যাত্মিক বলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইউরোপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসহিষ্ণুতা, শোষণ আর হিংসাচার; ভারতীয় মানসিকতায় সহনশীলতা, ক্ষমা, প্রেম। এই দুই বিপরীত মনোভঙ্গী স্পষ্টতঃই দুই দেশের সাহিত্যের প্রকৃতি বিপরীতমুখে চালিত করেছে।

এত কথা বলা হল শুধু এটি বোঝাতে যে, বাংলা সাহিত্যের আর যে অপূর্ণতাই থাক্, ঐতিহ্যের সম্পদে সে বিশেষভাবে সম্পন্ন। যে সংস্কৃত বাংলা ভাষার আদি মাতা, সেই সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ সংস্কার বাঙালী লেখকদের রচনাবলীর ভিতর ওতপ্রোত হয়ে আছে। আর শুধু কি ভাষার সংস্কার, ভাবের সাধনায়ও তাঁরা সবিশেষ অগ্রসর। প্রখ্যাত বাঙালী লেখক মাত্রেরই ভাবজীবন বিশেষ সমৃদ্ধ বলা চলে। এ ভাবসমৃদ্ধি এসেছে প্রাচীন ভারতের দার্শনিকতা থেকে, অহিংসা ও মানবপ্রেমের সংস্কার থেকে, জড়বাদবিমুখতা থেকে। উপনিষদের আত্মসমাহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের আদর্শ, বৌদ্ধযুগের সদ্ধর্ম ও শীলাচার, মধ্যযুগীয় সাধকদের সহজিয়া মানবপ্রেম, বৈষ্ণব সাহিত্যের নিবিড় ভাবাবেগ—এ সব আমাদের সাহিত্যের প্রতিটি সৎ লেখকেরই মনোজীবনের অঙ্গীভূত। আমাদের সেরা লেখকদের মধ্যে ইউরোপীয় লেখক-সুলভ জৌলুস না থাকতে পারে, বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত শিক্ষাদীক্ষায়ও তাঁদের কৃতিত্বে ঘাটতি থাকা সম্ভব, কিন্তু যে আন্তর সম্পদের প্রসাদে সাহিত্যিক সাহিত্যিকপদবাচ্য হন সেই দিক দিয়ে এঁরা ইউরোপীয় নোবেল-পুরস্কারবিজয়ী লেখকগণ অপেক্ষা অপকৃষ্ট কিসে? মনোভঙ্গীর প্রশ্ন, অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে দেখবার

বিশিষ্ট পদ্ধতির বিচার ছেড়ে দিয়ে নিছক শিল্পগত উৎকর্ষটাকেই যদি মানদণ্ডরূপে খাড়া করা হয়, সেখানেও সেরা বাঙালী কথাকারগণ ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের রথী-মহারথীদের তুলনায় কম যান কিসে? 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা 'জঙ্গম' কিংবা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কিংবা 'সত্যাসত্য' কিংবা 'ত্রিযামা'র মত বই ইউরোপে আখ্ছার লেখা হচ্ছে এ কথা বলতে পারলে উৎকট ইউরোপ-প্রেমিককে খুশী করা যায় বটে, সত্য কথা আদপেই বলা হয় না।

আধুনিক ইউরোপীয় কিংবা আমেরিকান সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ খবরাখবর আমরাও রেখে থাকি। সেই অভিজ্ঞতার নজিরে বলতে পারি, ওই দুটি সাহিত্যে 'আহা-মরি'-জাতীয় বই দু দিন বাদে বাদেই লেখা হচ্ছে না। বরং সত্য পরিস্থিতি এই যে, যে সকল আধুনিক দৃশ্যতঃ-সেরা বইয়ের নাম শুনলেই আমাদের কফি-হাউস কিংবা রেস্তোরাঁগামী কলেজ-পড়ুয়াদের, এমন কি সময় সময় তাঁদের ছোকরা মাস্টার মশায়দের, চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম হয়, সে সকল গ্রন্থ বিচক্ষণ গুণগ্রাহীর বিচারে চিম্‌টের সাহায্যে ছোঁবারও উপযুক্ত নয়। 'বেস্ট সেলার'-জাতীয় যে সকল হালের বিদেশী বই সিগারেটের টিনের মত ইউরোপীয় তথা আমেরিকান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে স্বতঃবিশ্বাসী কৌলীন্যাভিমানীদের হাতে হাতে ফেরে, প্রকৃত সাহিত্য-রসপিপাসু ব্যক্তির মনে সে সব বই নিরবচ্ছিন্ন ঔদাসীন্য ছাড়া আর কোন মনোভাবেরই বোধ হয় উদ্রেক করে না। তবু ফ্যাশান বড় জ্বালা, ফ্যাশানের দাসত্ব করতে গিয়ে আমাদের ইউরোপ-প্রেমিকেরা একেবারেই বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছেন।

আমাদের কথা হচ্ছে, ইউরোপীয় লেখকের বই হোক আর বাঙালী লেখকেরই বই হোক, তার গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে। বইয়ের নিজস্ব মূল্যের ভিত্তিতে বইয়ের বিচার,—বইয়ের ভাষা, লেখকের জাতি কুল গোত্র ইত্যাদি নিতান্তই অবান্তর প্রসঙ্গ। এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য লেখকের (নোবেল-পুরস্কারবিজয়ী হলে তো আর কথাই নেই)

নাম শুনলেই তাঁর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের আকুলতা বোধ করেন তাঁদের বলি, দয়া করে মাঝে মাঝে তাঁরা স্ব-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পর্যায়ের লেখকবর্গের দিকে একটু তাকান। তাঁদের সেরা বইগুলি একটু মন দিয়ে পড়ুন। ইউরোপীয়-মার্কিন লেখকেরা এঁদের তুলনায় স্বতঃই শ্রেষ্ঠ কি না সে বিষয়ে বিচার করুন। এঁদের ভিতর কারও লেখা প্রচলিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বলে মনে হলে সে কথা প্রকাশ্যে বলুন, জোর দিয়ে বলুন। আমাদের সাহিত্যের সহজাত উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মসম্ভ্রমহীনতার জন্যই আমাদের আজ এ অবস্থা। নিজেদের শ্রদ্ধা করতে না শিখলে অপরে আমাদের শ্রদ্ধা করবে—এ আশা বাতুলতা।

তা ছাড়া, এ প্রশ্ন আজও কেন আমাদের মনে জাগ্রত হয় নি যে, একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা বা সিগরিদ উণ্ডসেট বা আইভান বুনিন বা ফকনার বা উইনস্টন চার্চিল বা হেমিংওয়ে যদি নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন, তবে আমাদের শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, 'বনফুল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষই বা কেন নোবেল প্রাইজ পাবেন না? কেন আঞ্চলিকতার অপবাদ দিয়ে স্ব-সমাজভুক্ত লেখকদের আমরা জাতে পতিত করে রাখব? স্ব-সমাজভুক্ত বলেই কি তাঁদের প্রতি আমাদের এই তাচ্ছিল্য? উপরে পশ্চিম ভূখণ্ডের যে কয়জন লেখক-লেখিকার নাম করা হল, মোহমুক্ত মন নিয়ে বিচার করলেই দেখতে পাব, তাঁরা বাংলা দেশের সেরা লেখকদের তুলনায় কোন অংশে শ্রেষ্ঠ তো ননই, বরং অপকৃষ্ট। যাঁদের নিয়ে আমাদের গৌরব করবার কথা তাঁদের সম্পর্কে প্রশংসাকার্পণ্য আমাদের জাতীয় চিত্তদৈন্যেরই শুধু প্রমাণ করে।

আর নোবেল পুরস্কার কমিটীর বিচারনৈপুণ্যের প্রশ্ন যদি তোলা যায় সে ক্ষেত্রে বলব, যে মুহূর্তে তাঁরা উইনস্টন চার্চিলের রচনাকে পুরস্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন তন্মুহূর্তেই তাঁরা সাহিত্যরসবুদ্ধির কৌলীন্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন। এর পর আর তাঁদের প্রাচ্য বলেই প্রাচ্য লেখকদের প্রতি নাক সিঁটকাবার বা তাঁদের পথ অবরুদ্ধ করবার যুক্তি খাটে না। 'মাদার'

(দেলেদ্দা), কিংবা 'বারাব্বাস' কিংবা 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' জাতীয় বই যদি নোবেল পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়, তা হলে 'গীতাঞ্জলি'র পর বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ এক ডজন বই লেখা হয়েছে বলে আমার ধারণা, যেগুলিকে অনায়াসে এই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করা যায়। কিন্তু কে কার খোঁজ করে! কথায়ই বলে—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। প্রশংসার মুষ্টিভিক্ষাই যেখানে হাত দিয়ে গলতে চায় না, সে স্থলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ভিত্তিভূমি প্রস্তুতির মাথাব্যথা কার হবে?

জানি আমাদের লেখকদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথে প্রধান বাধা অনুবাদের স্বল্পতা ও অভাব। কিন্তু এই বাধা দুরতিক্রম্য মনে করবার কোনই কারণ নেই। কেন্দ্রীয় সাহিত্য-আকাদেমি যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন তা হলে প্রাদেশিক ভাষার সেরা বইগুলির ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ নিষ্পন্ন হতে পারে। শুনেছি আকাদেমির এ-জাতীয় একটি পরিকল্পনা আছে, ওই পরিকল্পনার কার্যকরী রূপদানে তাঁদের অগৌণে অগ্রসর হওয়া উচিত। বেসরকারী স্তরে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ-জাতীয় কার্যের দুরূহতা অনেক; প্রণালীবদ্ধ এবং সুসংহতভাবে একমাত্র জাতীয়-সাহিত্য-আকাদেমিই এ কাজ করতে পারেন। আমাদের সাহিত্যের আন্তর্জাতিক রসগ্রহণের পথে আমাদের সমাজব্যবস্থার বিশিষ্ট ধরনটি অনেক সময়ই প্রতিবন্ধকতা করে বলে যে যুক্তি সচরাচর বিদেশে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, আকাদেমির নিযুক্ত অনুবাদকগণ গ্রন্থসহিতে বিস্তৃত টীকাভাষ্য সংযোজনের দ্বারা সে বাধা অপসারণ করতে পারেন। আর, সত্যি বলতে, আমাদের সাহিত্যের বেলায়ই কেন বিশেষ করে এই পরিবেশের বাধার যুক্তি উত্থাপিত হবে ভাল বোঝা যায় না। নরওয়ের কৃষিজীবনের বিশেষ স্বাদগন্ধযুক্ত 'গ্রোথ অব দি সয়েল' পড়ে যদি আমরা বুঝতে পারি, ল্যাক্সনেসের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিউপিল'-এ চিত্রিত আইসল্যাণ্ডীয় মানুষদের ধারাধরন বুঝতে যদি আমাদের অসুবিধা না হয়, তবে আমাদের 'শ্রীকান্ত' 'পথের পাঁচালী' 'কবি' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' 'পুতুল-নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি বইয়ের তাৎপর্যই বা কেন ইউরোপীয় পাঠক গ্রহণ

করতে পারবেন না? সাহিত্যের সার্বভৌম আবেদনের কথা আমরা সর্বদাই বলে থাকি, তা যদি হয় সাহিত্যের উপজীব্য চিত্র-চরিত্রের পরিবেশের ভিন্নতা কদাচ বড় বাধাস্বরূপ গণ্য হতে পারে না।

আকাদেমির কার্যতৎপরতাকে শুধু অনুবাদের স্তরে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, অনূদিত গ্রন্থগুলির অনুকূলে আন্তর্জাতিক প্রচারের দায়িত্বও তাঁদের নিতে হবে। প্রচার ছাড়া আধুনিক জগতে কিছুই হবার যো নেই—এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিষয়-অনাসক্ত, অধ্যাত্মবাদী কবিও বুঝেছিলেন, তাই দ্বিতীয় বারের বার ইংলণ্ডযাত্রার প্রাক্কালে সুটকেসের ডালার ভিতর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি নিতে তিনি ভোলেন নি। ইংলণ্ডে পদার্পণ করে ইয়েট্স, রথেনস্টাইন, এজরা পাউণ্ড, স্টফোর্ড ব্রুক, এডমণ্ড গস, ওয়েল্স্ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সন্ধানের মধ্যে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের স্পৃহা ছাড়াও অন্য কোন মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল কি না কে বলতে পারে? আমাদের সমকালীন লেখকদের সম্পর্কে মুশকিল হয়েছে এই যে, এঁদের মধ্যে প্রায় কেউই রবীন্দ্রনাথের মত রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মান নি, তাঁদের জীবনে বিলেত যাওয়ার উপলক্ষও কদাচ ঘটে। আর ইয়েট্সের মত বন্ধুভাগ্য তো তাঁদের স্বপ্নাতীত। সুতরাং তাঁদের হয়ে যা কিছু করবার সরকারকেই করতে হবে। সরকার জাতীয় হোক বিজাতীয় হোক, সাহিত্যের এলাকায় সরকারের হস্তক্ষেপ আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু এই ব্যাপারে অন্ততঃ সরকার কোন বাধার সম্মুখীন হবেন না এই নিশ্চয়তা দিতে পারি। বাংলা সাহিত্যের যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাঁরা এ বিষয়ে জাতীয় সরকারকে সচেতন করতে পারলে বাংলা সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন।

প্রমথ চৌধুরী

শিল্পকলার ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাবশালী এক-একটি ব্যক্তিত্বের তিরোধান মানে এক-একটি যুগের অবসান হওয়া। সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের তেমনি এক যুগাবসান সূচিত হল। কাল ও সৃষ্টির পরিমাণের দিক দিয়ে এই প্রায়-অশীতিপর বৃদ্ধ (মৃত্যুকালে তাঁর আটাত্তর বৎসর বয়স হয়েছিল) নানাবিধ সৃষ্টির দানে একাদিক্রমে বহু বৎসর বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাতে তাঁর অভাবটুকু শুধুমাত্র মৃত্যুশোক হয়েই বাজবে না, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট বিপর্যয়রূপে প্রতিভাত হবে।

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে একা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী লেখকের ভাষা ও চিন্তার প্রণালী নিরূপিত করে গেছেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের ছাঁচ বেঁধে দেবার প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব যেমন কাজ করেছে, তেমনি সেই সঙ্গে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপরোক্ষভাবে, আরেকটি ব্যক্তিত্বের প্রভাবও সমান কার্যকরী হয়েছে। তিনি সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী—বাংলা গদ্যে নূতন রীতির প্রবর্তক পণ্ডিতাগ্রগণ্য হাস্যরসিক 'বীরবল'। ভাষাশিল্পের দুটি দিক—এক, প্রেরণা আর আবেগের দিক, ভাবের জোয়ারে ভাষাকে ফেনায়িত ও ছন্দায়িত করার দিক ; অপরটি তার কলাকারুর দিক, নিখুঁত ভাস্করের মত যত্নে ও ধৈর্যে, মেপে ও কেটে, ভাষাকে খোদাই পাথরের রূপ দেবার দিক। প্রথমটির শিক্ষা আমরা পেয়েছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ; দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত এসেছে গদ্যকুশল বীরবল থেকে।

কিন্তু বীরবলের কাছ থেকে আমরা শুধু কলাকারুর দিকটাই নিয়েছি এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। কলাকারু মানেই সজ্ঞান প্রচেষ্টা, চোখ কান মন খোলা রেখে কাজ করা। এইটে যদি মনে থাকে তা হলে দেখা যাবে, ওই কলাকারুর সূত্র ধরেই বীরবল আমাদের যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠা অভ্যাস

করতে শিখিয়েছেন। এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, গদ্য ঠিক কাব্যাত্মক
ভাবের বাহন হবার জন্য সৃষ্টি হয় নি ; গদ্যের আবেদন গদ্যময়ই হওয়া উচিত।
তাতে রস থাকবে, কিন্তু সেটা গদ্যের রস, কাব্যের রস নয়। গদ্যের রস সেই
ভাষাতেই সবচেয়ে প্রকাশমান যাতে চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রকাশভঙ্গির সারল্যের
সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবোধের প্রাবল্য থাকবে, লেখক যে প্রতিটি কথা মেপে মেপে
বসাচ্ছেন, আবেগের তোড়ে নিজেকে ভাসিয়ে নিচ্ছেন না, তার সাক্ষ্য থাকবে।
সফল গদ্যের নিরিখ তা-ই হলে বীরবলের নিকট আধুনিক সাহিত্যিকদের
ঋণের শেষ নেই।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় চলতি গদ্যকে জাতে তুলেছিলেন এইটেই তাঁর বড়
পরিচয় নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় হল চলতি গদ্যের মাধ্যমে যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচার-
প্রবণতাকে তিনি আবেগের উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর 'সবুজ পত্রে'র
আন্দোলনকে সেভাবেই আমাদের দেখা উচিত। যদিও বীরবলী রীতির
সারবত্তা আমরা আজকের দিনের লেখকবর্গ অল্পবিস্তর সবাই স্বীকার করে
নিয়েছি, তা সত্ত্বে নিরর্থক আবেগকে আমরা গদ্যের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বাতিল
করতে পেরেছি আমাদের গদ্য তার প্রমাণ দেয় না। বীরবলের সাধনাকে
সম্পূর্ণ করাই আমাদের এখন প্রধান কাজ—যুক্তিনিষ্ঠা আর বৈজ্ঞানিক
মনোভাব আমাদের একমাত্র মাপকাঠি হোক।

চৌধুরী মহাশয় তাই বলে রুক্ষ, ধূসর পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর
হাস্যরস, ব্যঙ্গ, আমোদপ্রিয়তা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে শুধু এই গুণেও তিনি
পাঠকের হৃদয়ে আসন দাবি করতে পারেন। অন্য যে কোন একজন সাধারণ
লেখকের হাতে যুক্তিনিষ্ঠার পথটুকু যেখানে বিশুষ্ক কঙ্করাস্তীর্ণ পথে পরিণত
হতে পারত, তিনি তাকে ফুল ছিটিয়ে সুরভিত করে তুলেছিলেন। তবে সে
ফুল কবিসুলভ কনকচাঁপা নয়, কাঠালীচাঁপা, তাতে গন্ধ ও ফলভার দুই আছে।
যুক্তিশৃঙ্খলা অনুসরণ করে পড়া গেল অথচ রসিয়ে রসিয়ে পড়া গেল—বোধ
করি প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনা সম্পর্কেই এই কথা সবচেয়ে বেশী খাটে।

বীরবলী ভঙ্গির আর একটি প্রধান লক্ষণ পাণ্ডিত্য। প্রমথ চৌধুরী যথার্থ

পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী, ফরাসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পড়াশোনা ছিল। কিন্তু তিনি শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্যেরই উপাসক ছিলেন না; দর্শন অর্থনীতি রাজনীতি সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র জ্ঞানের বিভাগে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ ছিল। তবে অন্যান্য পণ্ডিতদের থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের এইখানে তফাত যে, তিনি পাণ্ডিত্যকে রচনার ভিতর মিশিয়ে দিতে জানতেন; রচনার উপর দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কখনও বিস্ফোটকের গুটির মত ফুঁড়ে ওঠে নি—যা অনেক পণ্ডিতম্মন্য লেখকের লেখাতেই ওঠে। পাণ্ডিত্যকে হালকা ভাবে বহনের (ইংরেজী প্রকাশভঙ্গিটুকু ক্ষমনীয়) সফলতম দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে কেউ যদি থাকেন তিনি প্রমথ চৌধুরী। আমাদের দেশের লেখকদের রচনায় পাণ্ডিত্যের সংযোগ প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় না—পাণ্ডিত্য অর্জনের আগ্রহ প্রায়শ শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টার তলায় সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। বীরবলের কাছ থেকে এ বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের শেখবার আছে।

কি সাহিত্য-সমালোচনায়, কি ছোটগল্পে, কি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনায় বীরবলের পরিহাসরসিক বিদগ্ধ মনটির অভ্রান্ত পরিচয় মেলে। জীবন ও জগৎকে তিনি যে চোখে দেখেছেন তাতে সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই উদ্যত হয়ে ছিল, কিন্তু তাতে বক্রতা ছিল না। জীবনের অসুন্দর মলিন নির্বোধ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তার বিষ তাঁর কলমের কালিকে বিষাক্ত করতে পারে নি। তিক্ততা ও অসহিষ্ণুতা তাঁর অবিচল মনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। মানুষ ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে যথার্থ কৌতুকবোধ থাকলে তবেই গ্লানির দিকটাকে এমন হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন লেখকেরা প্রায়ই তিক্ততার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিক্ততা রচনার গুণ নয়, বিচ্যুতি—এই শিক্ষা প্রথম আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, দ্বিতীয় বীরবলের কাছে। তাঁর রচনার বিপরীত দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেছে।

কালচ্যর এক জিনিস আর কালচ্যর সম্বন্ধে কথা বলা বা লেখা আর-এক

জিনিস। সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত থাকলেই সেই নজীরে কেউ 'কালচার্ড' হয়ে যান না। কবি বা সাহিত্যিকমাত্রই কালচার্ড নন; অধিকাংশকেই আঁচড়ালে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে শিশুর, অন্তঃসারশূন্য রূপসর্বস্ব নারীর, নির্বোধের কিংবা আদিম মানবের প্রবৃত্তিগুলিই প্রবল। জীবন সম্বন্ধে যাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিবোধ নেই, বিভিন্ন চিন্তা ও কর্মের স্রোত এক অখণ্ড ঐক্যের উৎসমুখ থেকে প্রবাহিত এই চেতনা যাঁর জন্মায় নি, তিনি কখনও নিজেকে কালচার্ড বলে দাবি করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রমথ চৌধুরীর এই সামগ্রিক দৃষ্টিবোধ ছিল। পরিতাপের বিষয়, উদার শিক্ষা, বিদগ্ধ রুচি, পরিশীলিত মন এ যুগে বোধ হয় খুব বেশী লোকের জীবনে বেঁচে নেই—রাজনীতির কড়া হাতের মার খেয়ে আর নিদারুণ সর্বব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি পালাই-পালাই করছে। রবীন্দ্রনাথ-বীরবল ভাগ্যবান, তাঁরা উনিশ শতকের প্রসার্যমাণ নির্বিরোধ আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন—তাঁদের লিবারল্ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চেয়ে আমরা বড় জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি, কিন্তু তাঁদের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না।

আজন্ম-অভিজাত প্রমথ চৌধুরী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন তাই বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন না। নীতি হিসাবে জমিদারী প্রথাকে তিনি কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিলেন—তার নজীর রয়েছে তাঁর 'রায়তের কথা' বইতে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, তারই ফলে 'রায়তের কথা'র সূচনা। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হতে পারত, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনে তাঁর আপত্তি ছিল না।

ফরাসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু নিষ্ফলা পাণ্ডিত্যের তিনি ধার ধারতেন না। ফরাসী সংস্কৃতির সুচিক্কণ সৌকুমার্য ও সহজাত কৌতুকপ্রিয়তাকে বোধ হয় তিনি বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সজ্ঞানতঃ আমদানি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গল্পগুলিতে তিনি যে রস পরিবেষণ করেছেন সেই রসের চেহারা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁর 'আহুতি', 'চার-ইয়ারী কথা'

প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ ছোটগল্পের এক-একটি শোভন ও সুচারু গুচ্ছ। দর্শনের ক্ষেত্রে ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ-র প্রভাব তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী পড়েছিল।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার সর্বাঙ্গীণ আলোচনার উপলক্ষ এটি নয়। আপাততঃ এইটুকুই শুধু আমাদের বলবার যে, এই বহুমান্য সাহিত্য-গুরুর তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট যুগ অবসিত হল। সেই যুগ বাংলা গদ্যের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার যুগ—গদ্যকে গদ্যের চালে চালাবার যুগ। যদিও বত্রিশ বৎসর আগে 'সবুজ পত্র' মাসিকপত্রকে কেন্দ্র করে বীরবল-শিষ্যদের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, বীরবলের প্রভাব আজ আর শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই—বীরবলী ধারা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে গেছে। এই ধারা অবশ্য ভাবের বিপ্লব অপেক্ষা ভাষা-রীতির বিপ্লবসাধনের দিকেই অধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু ভাষার বিপ্লবের মধ্যেই যে এত দূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কে ভাবতে পেরেছিল?

পরিশেষে, বীরবল ১৩৩০ সালে লিখিত "নতুন কাগজ" প্রবন্ধে নতুন লেখকদের সম্বোধন করে যে কয়টি কথা বলেছিলেন আজও তাদের মূল্য ফুরিয়ে যায় নি। এখানে প্রবন্ধটির শেষাংশ উদ্ধৃত করলাম—নতুন লেখকেরা কথাগুলি দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বেন আশা করি ঃ

"নবীন লেখকদের আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তার অন্তরে কতটা শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটালেই মানুষ তার নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সচল সাহিত্যের সনাতন মূল। সুতরাং প্রতি নবীন লেখক যদি এই সংকল্প করেন যে, I am not going to be dominated by other people's opinion, but I am going to dominate the opinion of others—তা হলেই তাঁর লেখার আর মার নেই।"